পল্টনে
মাহ্‌বুব-উল আলম

পল্টনে

মাহ্‌বুব-উল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা—চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

পল্টনে

মাহ্‌বুব-উল আলম

প্রকাশক
ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
মে/৯৮

প্রচ্ছদ অংকন
সবিহ্-উল আলম
ওয়াহিদা সুলতানা রোজী

কম্পিউটার কম্পোজ
কম্যুনিক্যান্টস্

মুদ্রণ
বিকল্প মুদ্রণ
৫৫/এ ইনার সার্কুলার রোড
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৩৪৩১, ৮৪১০১৯

POLTANE
By Mahbub-ul Alam
Published by Munawwar Ahmad
Chairman
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.
Chittagong. Dhaka
Bangladesh

Price : Tk : 55.00
$ 2.00

ISBN : 984-493-033-2

www.pathagar.com

'যুদ্ধ যদি নিষ্ঠুরতার একশেষ হয়, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের একশেষ বলিতে হইবে ঐ জাতির, যাহারা নিজের অজ্ঞাতে কি অনিচ্ছায় এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে।'

—মাহ্‌বুব-উল আলম

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- **ইতিহাস**
  বর্মার হাঙ্গামা
  চট্টগ্রামের ইতিহাস ঃ পুরানা আমল
  ঃ নবাবী আমল
  ঃ কোম্পানী আমল
  চট্টগ্রামের কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার
  চট্টগ্রামের অলী দরবেশগণ
  চট্টগ্রামের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা
  বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত
  রাশিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচার

- **উপন্যাস**
  মো'মেনের জবানবন্দী
  মফিজন

- **জীবনী**
  দিদারুল আলম জীবন কথা
  কৃতী জীবন-চরিত

- **গল্প সংগ্রহ**
  তাজিয়া
  পঞ্চ অন্ন

- **স্মৃতি কথা**
  পল্টন জীবনের স্মৃতি

- **সাময়িকী**
  আলাপ
  সঙ্কট কেটে যাচ্ছে
  রঙবেরঙ

- **ব্যঙ্গ**
  গোঁফ সন্দেশ
  প্রধান অতিথি ও তাজা শিংগী মাছের ঝোল

- **বড় গল্প**
  গাঁয়ের মায়া

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মাহ্‌বুব-উল আলম, কথা-সাহিত্যিক মাহ্‌বুব-উল আলম। এ নাম মুখে আসলে, চোখে ভাসলে, আমার স্মৃতিতে জেগে ওঠে একটি সদাহাস্য মুখ। সাধারণ জুতোয়, সাদা পায়জামায়, আজানুলম্বিত আচকানে, কখনও মাথায় টুপী, কখনও টুপীবিহীন প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ এই পিতৃপুরুষ যেন চেয়ে আছেন আমার দিকে স্নেহের পরশে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য আড্ডার মধ্যমণি, সবার মুরব্বী যেন তদ্রূপ একটি আসরে আমার রচনাবলী শুনছেন, শুধরে দিচ্ছেন, হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছেন সৃষ্টিশৈলীর কারুকার্য। চট্টগ্রামের অনেক উদীয়মান লেখক এই আসরে হাজির থেকে তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন।

সাহিত্য রচনায় মস্তিষ্কের তুলনায় হৃদয়ের ভূমিকা বড়—এই মতের বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। টুপী, আচকান, পায়জামা পরিহিত এই মানুষের ছিল উদার, বিরাট একটা মন। তাঁর এই বিশালতা উপলব্ধির, লেখনী-মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইলে ভাষাও হারিয়ে যায়। সৈয়দ আলী আহসানের এক রচনায় কোথায় যেন পড়েছিলাম; তিনি নিজে, মাহ্‌বুব-উল আলম এবং বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দীন পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে পাকিস্তান সরকার আয়োজিত এক সাহিত্য সংস্কৃতির আসরে আমন্ত্রিত হয়ে করাচী যান। একই হোটেলে ছিলেন তাঁরা। স্বভাবতই খাওয়া দাওয়া, বেড়ানো, বিবিধ আলোচনা একসাথেই হতো। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় "দেখলাম, কোট প্যান্ট স্যুট পরিহিত আব্বাসউদ্দীন ধর্মীয় পথ ও মতে অত্যন্ত গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণ অথচ টুপী আচকান পরিহিত মাহ্‌বুব-উল আলম অত্যন্ত উদার"।

সেই উদার হৃদয় মাহ্‌বুব-উল আলমের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হতে যাচ্ছে। ১লা মে ১৮৯৮, তাঁর জন্ম। এক কাকতালীয় যোগাযোগে তাঁর সাথে যেন আমার নাড়ীর টান বুঝতে পারছি। আমারও জন্ম ১লা মে, তবে ১৮৯৮ নয় ১৯৩৮ এ। আবার আমারও জন্ম তাঁরই মত দরিদ্র অথচ শিক্ষিত আলেম পরিবারে। এই উপলক্ষে, 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'র রেশ ধরে তাঁর অপ্রকাশিত রচনা 'পল্টনে' পাঠকবৃন্দের কাছে উপহার দিতে পেরে আমি গৌরবান্বিত, অত্যন্ত আনন্দিত।

১লা মে ১৯৯৮

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ
বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড
চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

দু'টি কথা

১৯৩৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে নজরুল মাহ্‌বুব-উল আলমকে লক্ষ্য করে বলেন—'বেচারী যুদ্ধের স্মৃতিটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। স্মৃতিটা তাঁর মানসে সব সময়ই টুং টুং কচ্ছে।'

'নজরুল প্রেক্ষা' নিবন্ধে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে নজরুলের এই উদ্ধৃতি দিয়ে মাহ্‌বুব-উল আলম মন্তব্য করেছেন—"এটা সত্য। জীবনের সবচেয়ে 'মনে দাগ কাটে সময়' আমার কেটেছে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে—উনিশ থেকে বাইশ যখন বয়স।"

মাহ্‌বুব-উল আলমের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর জীবনে পল্টন জীবনের অন্যতম যে প্রভাবটি পড়েছিল তা' হলো শৃঙ্খলা। সুশৃঙ্খল জীবন—সব কাজ নিয়ম মাফিক সময় মতো করা—তাঁর বরাবরই পছন্দ ছিল। এবং এটা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক।

'পল্টন জীবনের স্মৃতি' প্রকাশিত হওয়ার (১৯৪০) বহু বছর পরও এবং পল্টন জীবনে বহু পূর্বে ইতি টানলেও (১৯১৯), পল্টনের আনন্দ-বিষাদে মেশানো ঘটনা তাঁর স্মৃতিতে সব সময়ই ছিল উজ্জ্বল। এ কারণে তাঁর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ভাগ পল্টন-জীবন নির্ভর।

অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে—১৯৪৮-এর দিকে (?) তিনি 'রং বেরং' নামে একটি গল্প-সংকলনের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। প্রকাশকের কাছে হারিয়ে যাওয়া এই 'রং বেরং'-এও অধিকাংশ গল্প-নিবন্ধ-রসরচনা ছিল পল্টন-জীবন নির্ভর—অবশ্যই হাস্য রসাত্মক। হারিয়ে যাওয়া 'রং বেরং'-এর জন্য তাঁর আফসোস ছিল। পরবর্তীতে তাঁর নিজ পত্রিকা 'জমানা'র সাপ্তাহিক সাহিত্য পাতাতে তিনি ১৯৭৬ সালে 'রঙবেরঙ' বিভাগ চালু করেন। হয়তো নামের সূত্র ধরে (বানানে পরিবর্তন করলেও) কিংবা 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' পড়ার পর আবুল কালাম শামসুদ্দীনের খেদ 'যেহেতু এই জীবন-স্মৃতি সত্যকার রস-সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, তাই এই অসমাপ্ত রচনা সাহিত্য-রসিকের মনকে পীড়া দেয়।' ঘুচাবার জন্য তিনি আবারও সৈনিক-জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে উৎসাহী হন। অবশ্য ১৯৫২ ও ১৯৫৫তে 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে মাহ্‌বুব-উল আলম আবুল কালাম শামসুদ্দীনের খেদ অনেকটুকু দূর করেন।

বহু খোঁজ করে 'জমানা'র শুধু ১৯৭৬ সালের ভল্যুমটা পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে অন্যান্য বছরের 'জমানা'র সাহিত্য পাতার 'রঙবেরঙ' বিভাগে পল্টন-জীবন নিয়ে মাহ্‌বুব-উল আলমের রস রচনা থেকে থাকবে। 'রঙবেরঙ' বিভাগে তাঁর লেখার বিষয়-বৈচিত্রের অন্ত ছিলনা (তার মধ্যে ছিল পল্টন নিয়ে লেখা-পত্রও)।

যেহেতু, ইতোমধ্যে হাতের কাছে পাওয়া রচনাগুলো নিয়ে (পল্টন সংক্রান্ত লেখা বাদে) রঙবেরঙ প্রকাশিত হয়েছে, সেহেতু শুধুমাত্র পল্টনের লেখাগুলো নিয়ে আরেকটি সংকলন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সংকলনটিই 'পল্টনে' নাম নিয়ে পাঠকের কাছে আজ উপস্থিত। সংকলনের নামকরণ লেখকের নয়। তবে ধারণা—লেখকের জীবদ্দশায় এ সংকলনটি বেরুলে, তিনি এ ধরণের নামই হয়তো পছন্দ করে নিতেন।

মাহ্‌বুব-উল আলম আগা-পাশ-তলা মৌলিক শিল্পী ছিলেন। বাংলা ব্যাকরণে তিনি সড়গড়

www.pathagar.com

থাকলেও, কিছু কিছু বানানের ব্যাপারে তিনি নিজস্ব রীতি তৈরি করে নিয়েছিলেন, যেমন— কর্বেন, পার্বেন, ধর্বেন, (করবেন, পারবেন, ধরবেন); কচ্ছিলাম (করছিলাম); জিগ্যেস (জিজ্ঞেস); ইত্যাদি এবং আরো অনেক। তিনি আবার, ফার্সী ও ইংরেজী শব্দও চমৎকার মানানসইভাবে ব্যবহার করতেন। ঠিক তেমনভাবে আঞ্চলিক শব্দও। বানানের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব রীতি-নীতি রক্ষা করাটাই বাঞ্চনীয় মনে হওয়ায় ওগুলো যেমন-কে-তেমন রেখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এগুলো মুদ্রণ-প্রমাদ নয়।

১৯৫৫-তে 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার আরো ৪৩ বছর পরের 'পল্টনে'ও পাঠক মাহ্‌বুব-উল আলমের মৌলিক ভাষা-শৈলীর খোঁজ পাবেন।

সবিহ্-উল আলম

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	কেন মদ খাওয়া ?	৯
২.	যাদুকর	১৩
৩.	বিচিত্র অভিজ্ঞতা	১৭
৪.	আজরাইলের মার	১৯
৫.	উল্টো মহারাজ	২৩
৬.	দোসর	২৭
৭.	গুর্খা সংবাদ	৩২
৮.	হিন্দী-বিভ্রাট	৩৭
৯.	মিলিটারীতে সমকামিতা	৪১
১০.	শোনার নজরুল	৪৫
১১.	রাজা ও দেশ	৪৮
১২.	আহেলা বিলাতী	৫১
১৩.	অমিশুক ও অতি-মিশুক	৫৭
১৪.	নল থাকবে আকাশমুখী	৬০

www.pathagar.com

কেন মদ খাওয়া ?

ইরাক ঃ ১৯১৭-১৯

প্রত্যেক য়্যুনিটের আলাদা মেস্। ৯ বেস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোরে আমরা বাঙ্গালী পল্টনের যত জন আছি তাদের নিয়েও আলাদা মেস্। সকলের ভোটে আমি হলুম মেস প্রেসিডেন্ট। মেসগুলো কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেন।

একবার হাসপাতাল যেতে হয়েছিল। তখন জার্মেন ডুবো জাহাজের উৎপাতে রসদ সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্রই খাদ্যাভাব। হাসপাতালেও।

পেটে সব সময় যেন বৈশ্বানর জ্বলছে। হাসপাতালে সব সময় শুয়ে থেকেও চেষ্টা কিরূপে খাবারের জোগান বাড়বে।

সৈন্যদের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে হাসপাতালে ওয়াই-এম সি-এ মস্ত বড় তাঁবু খাটিয়ে রেখেছে।

খেলার নানাবিধ আয়োজন আর নানা ভাষার গ্রামোফোন রেকর্ড। এই তাঁবুতে বসে একদিন আমার বুদ্ধি খুলে গেল।

দেখলাম ঃ হাসপাতালের বাবুর্চিরা হচ্ছে সব পশ্তুভাষী। অথচ পশ্তু রেকর্ডগুলো এক দিকে পড়ে থাকে। ওগুলো বাজানোর দিকে কারও নজর পড়ে না আর বাবুর্চিদের ঐ তাঁবুতে প্রবেশের কোন বিধি নেই।

আমি একদিন লুকিয়ে বাবুর্চিখানায় ঢুকলুম। বাবুর্চিরা অবাক হয়ে গেল। আমি বল্লুম ঃ তোমরা পশ্তু গান শুনতে পাওনা। আজ থেকে আমি পশ্তু গান বাজাবো, তোমরা শুনো।

হঠাৎ গ্রামোফোনে পশ্তু গান বেজে উঠলো। ঐ গানেরও একটা আকর্ষণ আছে। বাবুর্চিরা তো শুনে খুশীতে বাগ-বাগ। অন্য লোকের কানেও সেটা অদ্ভুত সুন্দর শোনাল, আর এদিকে বাবুর্চিরা হাত সাফাই করে আমাকে রোটির অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে লাগল।

খৃষ্টানদের বড় দিন ২৫শে ডিসেম্বর এসে গেল। যুদ্ধে জেতার পর এই প্রথম বড়

www.pathagar.com

দিনের উৎসব।

এর মধ্যে পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

পুনর্বাসনের একটা প্রথম কাজ হলো 'গ্রেইভ্‌স্ কমিশন' শহীদদের কবরস্থ করার উদ্যোগ।

যুদ্ধে অনেক কিছুই সময়ের উপর নির্ভর করে। যুদ্ধের পড়তা—কখনও জয়, কখনও পরাজয়। পরাজয়ের মুখে তো বটেই—জয়ের মুখেও বহু লোক ক্ষতি হয়—মরে, আহত হয়ে হাসপাতালে মরে। মৃতের লাশ হয়তো যুদ্ধ ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে। হয়তো সময় বাঁচানোর জন্যে কোন রকমে একটা গর্ত করে লাশগুলোকে সেই গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়।

গ্রেইভ্‌স্ কমিশনের কাজ হলো ঃ যত লাশ যত খানে পড়ে আছে সেগুলোকে উদ্ধার করে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গোর দিয়ে পরিচয়-ফলক লাগিয়ে দেয়া। বছরের পর বছর এ কাজ চলতে থাকে।

বড়দিনের উৎসবটা বিপুল ভাবেই করা ঠিক হয়েছিল। পাকা চুল সিনিয়র বৃটিশ অফিসাররা বেরিয়েছিলেন এর উদ্যোগ আয়োজনে।

একজন এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্লেন আমার অফিসে।

ঃ তুমি মেস-প্রেসিডেন্ট ?

ঃ ইয়েস, স্যার।

ঃ উৎসবের জন্যে প্রত্যেক মেস্‌কেই টাকা দেওয়া হবে। তোমাদের কি কি চাই একটা লিষ্ট দেবে।

লিষ্ট পাঠিয়ে দিলুম পরের দিন। প্রধান আইটেম ঃ একটা রাজহাঁস—যা' নইলে নাকি বড় দিনের উৎসব হয় না। সঙ্গে ধরে দিলুম কিছু মসলা ইত্যাদি।

কিন্তু, পরের দিন বুড়ো অফিসার এসে আবার আমার অফিসে দর্শন দিলেন।

ঃ তুমি স্মোক কর না ?

ঃ না, স্যার।

ঃ ড্রিঙ্ক কর না ?

ঃ না, স্যার।

স্মোক করেনা, ড্রিঙ্ক করে না—এমন লোককে কোন্ বেকুবেরা মেস-প্রেসিডেন্ট করেছে ? এসব ধরে দেবে, বুঝলে ?

এই বলে বুড়ো আমাকে লিষ্ট ফিরিয়ে দিলেন।

উৎসবের দিন কিন্তু চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। মদ পেটে পড়লে চেনা-মানুষ

www.pathagar.com

যে কিরূপ বিকৃত হয়ে যেতে পারে—তাই দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম।

আমাদের বাবুর্চিখানায় পাক কর্তো রামা আর ইব্রাহীম। সেদিন দু'টিতে মার-পিট হয়নি। রাজহাঁসকে কুটে ডেক্‌চিতে করে চুল্লীতে উঠিয়েছে। পাক হলে সকলে খাবো—এই আশা।

কিন্তু, আঙ্গিনায় দেখা গেল সারা ষ্টোরের চীফ ক্লার্ক জেফ্রীসকে।

জেফ্রীস গোরা পল্টনের সার্জেন্ট। কাজে যেমন দক্ষ, ঘুষি—লড়ায়ও তুখোড়। আর হাসি-মস্করায়ও অদ্বিতীয়। মদ গিলে এমন মাতাল হয়েছে যে নালা পরিষ্কারের ব্রাস-মুখো লম্বা হাতল সেটাই বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই 'যুদ্ধং দেহী' আহ্বান জানাচ্ছে।

রামা আর ইব্রাহীম জেফ্রীসকে দেখেই 'য পলায়তি স জীবতি' নীতি অনুসরণ করেছে। আর জেফ্রীস হাতলের এক ঘুরানীতেই চুল্লীর উপরিস্থ ডেক্‌চিকে ছিটিয়ে উঠোনে ফেলে দিলে আর সেটা গড়িয়ে গিয়ে স্থির হলো নর্দমায়—হতভাগ্য রাজহাঁসের টুকরোগুলিকে ময়লা পানিতে উগরে দিয়ে।

আমি আর যতীন—যে দুজন মদ খাইনি, এগিয়ে চল্লাম আমাদের আস্তানার দিকে।

পথে য়ু কে দামোদরণের দফতর। পাঁড় মাতাল বলে আগের থেকেই তার বদনাম আছে। এখন বড় দিনের উৎসবে তাঁর এলাহী কাণ্ড।

চেয়ার ছেড়ে দামোদরণ মাটিতে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। এমনিতে সে ইণ্ডিয়ান ফলোয়ারদের ইন্‌চার্জ ঃ বাবুর্চি, পানিওয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুলী, মজুর—যে নামেই ভর্তি হয়েছে সকলের উপরালা—প্রায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সকলে তাকে বাঘের মত ভয় করে। এর মধ্যে পোর্টার কোরের লোকও আছে—খুনের দায়ে আন্দামানে যারা জন্ম মেয়াদ খাটছিল আর যুদ্ধে নাম দিয়ে যারা গায়ে হাওয়া লাগাবার সুযোগ করে নিয়েছে। তারাও চারদিকে ঘির দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

দামোদরণের ভাবটি হলো ঃ সে মহা পাতকী, তার সকলের ক্ষমার দরকার। সে কেঁদে ভাসিয়ে ধরা গলায় বল্‌ছে ঃ ইদি তু হাম্‌কো মাফ কর দে ; এত্‌ওয়ারি, তু হাম্‌কো মাফ কর দে। ইদি এত্‌ওয়ারি হলো ভীষণতম খুনে। তারাও সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তারা বল্‌ছে ঃ বাবুজি আপনে কেয়া বোল্‌তা! আপনি কেন আমাদের কাছে মাফ চাবেন !

এই কথায় দামোদরণ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাদের তাড়া করছে—আক্রমণ করার জন্যে নয়—তাদের পায়ে ধরে মাফ চাওয়ার জন্যে। আর, তারাও পালিয়ে থেকে চারদিকে চক্কর দিচ্ছে।

আমরা সাবধানে দামোদরণের এলাকা পার হয়ে গেলুম। পাছে দেখতে পেয়ে

www.pathagar.com

তার মাথায় ঢোকে যে আমাদের কাছেও তার মাফ চাইতে হবে এবং সে মাফ আদায় করার জন্যে সে আমাদের পেছনেও তাড়া করে!

আমাদের আস্তানায় চট্টরাজের কামরায় ঢুকলুম। সে সারা কামরায় এমন বমি করেছে যে তার দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিয়ে টেকা দায়, আর সে মাতাল হয়েছে এ রকম কোন উক্তি শুনলেই চট্টরাজ মারমুখী হয়ে উঠছে। বর্ধমানের ব্রাহ্মণ একটু বোকাটে হলেও ডাঙ্গী জোয়ান এবং গায়ে হাতীর ন্যায় বল। আমরা তার নরকে তাকেই ডুবে থাকতে দিলুম। কৌশলে বেরিয়ে এসে দরজায় বাহির থেকে ছিট্‌কিনি তুলে দিলুম। কাল সকালে খুলে দেখা যাবে তার অবস্থা।

দয়ালপদ পালের কামরায় ঢুকলুম। সে বয়স্ক মানুষ। তার হচ্ছে ক্যাম্বিশের খাটিয়া। খাটিয়ার উপর হাঁটু গেঁড়ে সে যেন যোগে বসেছে। চোখ প্রায় বোজা। যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। কিন্তু, মাঝে মাঝেই এমন বোমা ফুটানোর ন্যায় বাত-কর্ম কচ্ছে যে—নেহাৎ ক্যাম্বিশের খাটিয়া, তা'না হলে সেটা যেন দীর্ণ হয়ে শূন্যে উড়ে যেতো।

শান্তশিষ্ট প্রকৃতিস্থ মানুষ মদ খেয়ে নিজে জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে এরূপ অযোগ্য আচরণ করে কি সুখ, কি আনন্দ পায় আমি বুঝতে পারিনে।

বৃটিশের অধীনতা মুক্ত হয়ে পাকিস্তানী আমলে দেখেছি বৃটিশের ছেড়ে যাওয়া—বিশেষ করে বাণিজ্যিক সংস্থায় এ দেশীয়রা দখল পেয়েই বহু তরুণ মদের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরে ক্লাবলাইফের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ সস্ত্রীক আসর জমাতেন এবং স্ত্রীদেরও এ ব্যাপারে হাতে খড়ি হচ্ছিল।

এমন সময় মার্শাল ল আসে এবং আমরা বিপদ গুণি। কারণ, আমরা ধরে নিয়েছিলুম যে এবার মদ্যপান উৎসাহ পাবে। কিন্তু, কাজের বেলা দেখা গেল মিলিটারী এ বিষয়ে অনেক সীমিত। আজম খাঁ যখন গভর্ণর তখন সন্ধ্যাকালে যেসব অনুষ্ঠান হতো তিনি তাদের অপ্যায়ন খানা-পিনার যেমন আয়োজন রাখতেন সেরূপ জমা'ৎ করে মগরীবের নামাজ পড়ারও ব্যবস্থা রাখতেন।

ফলে মদ্যপায়ীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

যাদুকর

ভারতীয় যাদুকরের খুব নাম। সারা দুনিয়ায়।

আমাদের ছোট বেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাড়িওয়ালা জটাচুলা রহস্যময় চেহারার লোকেরা ভোজবাজীর খেলা দেখাতো।

এরা ছিল বেদে—মুসলমান। সাপও নাচাতো, যাদুও দেখাতো, আর কেউ কেউ দরবেশী দমও মারতো।

ঝোলা-বাঁশী সামনে রেখে দিয়ে চত্তালের হাড্ডি দিয়ে হাতের তালুতে গোল করে একবার ঘুরিয়ে আনতো, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেতো সে গোলের ভেতর ফুটে উঠেছে চাঁদির একটা টাকা আর সে 'উড় যা' আদেশ করা মাত্রই সে টাকা 'চন' শব্দ করে আকাশ পানে উড়ে যেতো।

সে বলতো ঃ নামাজ পড়বো, অজু কর্তে হবে, এক বদনা পানি নিয়ে এসো। তখন এক জোড়া কাঠের খড়ম বের কর্তো। খড়মে ভর করে সে অজু বানালো। কিন্তু, সে খড়ম কিছুতেই পা থেকে আর ছোটান যায় না। কেউ পারে না ছোটাতে, কিন্তু বাজীকর হাত লাগান মাত্রই খড়ম ছুটে গিয়ে পা মুক্ত হয়ে গেলো।

সে আমের একটা আঁটি মাটিতে পুঁতলো। দেখতে দেখতে সে আঁটি থেকে একটা গাছ হয়ে গেলো—আরও আশ্চর্য, দেখা গেল সে গাছে একটা আম ধরে পেকে আছে।

কিন্তু, দুনিয়ার লোক এর চেয়েও আশ্চর্য খেলা দেখেছে ভারতীয় যাদুকরের। তারা লিখে গেছে বিভিন্ন বইতে।

ভারতীয় যাদুকর শূন্যে একখানা রশি ছুঁড়ে মার্লে। আর সেই রশি দাঁড়িয়ে গেল একটা খুঁটির মতো। সেই খুঁটি বেয়ে শূন্যে অদৃশ্য হলো যাদুকরের বাচ্চা শাগ্‌রেদ। তার এক এক অঙ্গ—হাত, পা, পেট, পিঠ প্রভৃতি আলাদা আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আর যাদুকর শাগ্‌রেদের নাম ধরে ডাকা মাত্র সে রশি অদৃশ্য হয়ে গেল আর

www.pathagar.com

বাচ্চা শাগ্‌রেদ সাড়া দিয়ে দৌড়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমাদের দেখা দুনিয়ায় এমন জায়গা ছিল না যেখানে বাঙ্গালী কেরানী নেই আর হঠাৎ একদিন ভারতীয় যাদুকর তার ঝোলা ও বাঁশী নিয়ে দেখা দেয় নি।

সেবারে উত্তর কুর্দীস্তান অভিযানে গিয়ে আমরা বহু সৈন্যদল একত্র হয়েছি, অধিকাংশই বৃটিশ-সেনাবাহিনী। হঠাৎ সেখানে দেখা দিলে যাদুকর। এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু হতে পার্তোনা। আর্মীর বড়-ছোট ভেদাভেদ ভুলে সকলে ছোট ছেলের ন্যায় চোখে কৌতূহল ও বুক-ভরা বিস্ময় নিয়ে তাকে ঘিরে ধর্লে।

য়ুরোপীয়ান যাদুকরের খেলাও আমরা দেখেছি। খেলার তাস শাফ্‌ল্ করে আপনাকে বল্লে ঃ যেখানটায় ইচ্ছে কোণা ছিঁড়ে দিন। সেই ছেঁড়া কোণা হারিয়ে গেল। কোথাও পাওয়া যায় না। পরে, এক স্তূপ কমলা লেবুর মধ্য থেকে একটাকে কেটে দেখা গেল ঃ দু'টা কোষের মধ্যখানে এই ছেঁড়া কোণা ঢুকে রয়েছে।

হউক দৃষ্টি-বিভ্রম। দর্শকদের একেবারে হকচকিয়ে দেওয়া যায়।

এই বাজীকর অনেক খেলা দেখালে। পরে একটা কল বের কর্লে। লেফটেন্যান্ট হাছি খুব তাগড়া জোয়ান। তাকে কল হাতে দিয়ে বল্লে ঃ দেখ, এটা বিলকুল খালি কি না।

হাছি দেখলে । বল্লে ঃ খালি।

বাজীকর বল্লে ঃ এর ভেতর কোনরূপ মুদ্রা রাখো, আর খুব করে নাড়ো। নাড়তে নাড়তে মুদ্রার আর শব্দ শোনা যায় না।

বাজীকর বল্লে ঃ মুদ্রাটা কোথায় গেল দেখতে হবে। তুমি হাত পাতো। আমি কলটা উপুড় করে ঢালছি।

হাছি হাত পাত্‌লে। উপুড় করা কল থেকে হাছির পাতা হাতে পড়্‌লো মুদ্রা নয়, একটা জ্যান্ত সাপ।

হাছি দিলে এক লাফ। সকলে হেসে উঠলো। সকলের চোখে বিস্ময়। বাজীকর ঝটিতি সাপটাকে নিয়ে খেলাতে আরম্ভ করেছে।

আমাদের মধ্যেই ছিল এক যাদুকর। চট্টগ্রাম বকশির হাটের হৃদয় ডাক্তারের ভাই আশু। হৃদয় ডাক্তারের দোকানের সামনে এক মরা মানুষের ঠাট (কঙ্কাল) লটকান থাকতো। এই থেকে সকলে এক নামে তাঁকে চিনতো।

আশু তার বন্ধুদের নিয়ে বহু চিঠিপত্র ছাপিয়ে বিলি কর্লে যে ঃ সামনের ১লা এপ্রিলে সে আমাদের মেসের সামনে যে খালি প্রকাণ্ড ব্যারাক আছে ওখানে ম্যাজিক দেখাবে।

এখন ১লা এপ্রিল মানুষকে বোকা বানানোর একটা রেওয়াজ য়ুরোপীয় সমাজে

www.pathagar.com

বহুদিন ধরে চলে আসছে। চুনোপুঁটি থেকে আরম্ভ করে যত অফিসারই হউন তাঁকে বোকা বানিয়ে মজা করা যায়।

আবার ম্যাজিকের আকর্ষণ এমন যে—সত্যই যদি ম্যাজিক দেখায় তাঁর দর্শন থেকে নিজেকে বঞ্চিত কর্তে কিছুতেই মন চায় না।

আর, আশুরা জোর আয়োজন শুরু করে দিলে। কতকগুলো ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টও ছিল। তাদের উপজাতীয় সাজ-পোশাক হাল-হকীকৎ আমাদের মনে বড্ড কৌতূহল জাগাতো। তারা ম্যাজিক দেখতে আসবে ঠিক করে ফেলেছিল।

আশুরা ব্যারাকের ভেতর উত্তরের দেওয়ালে ফিট করে উল্টিয়ে রেখেছিল একখানা মস্ত প্ল্যাকার্ড।

দর্শক-সমাগমে ব্যারাকে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। সাহেব-সুবো থেকে আরম্ভ করে সকলেই আসন গ্রহণ করেছিল। সকলের দৃষ্টি মঞ্চের দিকে।

কিন্তু সকলের বড় সাহেব ম্যাকইলওয়েন কিছুতেই ভিতরেও ঢুকলেন না, আসনও গ্রহণ কর্লেন না। শুধু ব্যারাকের সম্মুখে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

অবশেষে বাইরে থেকে কৌশলে সে প্ল্যাকার্ড উল্টিয়ে দেওয়া হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখলে তাতে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'এপ্রিল ফুল'! সায়েবরা 'মাই গড্' বলে পা চালিয়ে দিলে। কিন্তু, উপজাতিরা ক্ষেপে যেতে পারে। সেজন্যে তখন তখনই ঘোষণা করা হলো যে এ জায়গাতেই ৫ই এপ্রিল বৈকালে ম্যাজিক দেখান হবে।

ম্যাজিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে যে দ্রব্যগুণ বিদ্যায় যাঁরা বিশেষজ্ঞ, খেলা প্রদর্শন করে তাঁদেরও বিস্ময়ে অভিভূত করা যায়।

আশু আমার সাহায্যে আমাদের ষ্টোর থেকে নানারূপ মৌলিক ও মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ যোগাড় করে নিলে।

যাদুগীরদের এক বড় সম্বল বাকতাল্লা। চোমরানো গোঁফ। রহস্য-ভরা দৃষ্টি এবং বাকতাল্লার সাহায্যে সে শীঘ্রই পরিবেশ সৃষ্টি করে নিলে। খেলা দেখানোর ব্যাপারেও সে নিপুণ। বহু রসিকতারও সৃষ্টি কল্লে যেটা সকলেই উপভোগ কর্লো।

কিন্তু তার মাষ্টার-পীস হলো অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষকে হাঁটান। এটার সে নাম দিয়েছিল ঃ আগুনকে হিপ্‌নোটাইজ করা। এটা পর্বত-প্রমাণ দিশবন্দী।

এজন্য প্রকাণ্ড গর্ত করা হয়েছিলো। যেমন দৈর্ঘ্য, তেমনই পাশ। কাঠ জ্বালিয়ে এমন প্রচণ্ড আগুন জ্বালান হয়েছিল যার কাছে ঘেঁসা একরূপ অসাধ্য মনে হচ্ছিল।

আশু প্রকাণ্ড লাঠির আগায় চটের ন্যাকড়া জড়িয়ে সে ন্যাকড়াকে বারবার বিশেষভাবে প্রস্তুত পানির মধ্যে ডোবাচ্ছিল এবং মুখের ভঙ্গী বানিয়ে বিড়বিড় মন্ত্র পড়ে ন্যাকড়া বুলিয়ে সে প্রচণ্ড আগুনকে নাকি ঘুম পাড়াচ্ছিলো।

www.pathagar.com

এক পর্যায়ে সে ঘোষণা কল্লে ঃ এই আগুনকে আমি ঘুম পাড়িয়েছি। আপনাদের কারো সাহসে থাকে, উঠে আসুন, আমি এই আগুনের মধ্য দিয়ে আপনাদের পার করে আনবো, আগুন আপনাদের কোন ক্ষতি কর্বে না।

সাহসের নামে চ্যালেঞ্জ করাতে উঠে এলো এক দল ফ্রন্টিয়ারের পাঠান। আগু মন্ত্র পড়ে তাদের সে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্য দিয়ে হাঁটিয়ে আনলে, অঙ্গার তাদের কোন ক্ষতি কর্লে না।

তারপর আরও এক দল, আরও এক দল, আরও এক দল। হাততালি পড়তে লাগলো। আগু পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য তৈরী হচ্ছে।

এমন সময় অভাবিত ঘটনা। আমাদের বর্ধমানী বন্ধু বোকা চট্টরাজ একদম গর্তের ধারে এসে দাঁড়ালো। বল্লে ঃ জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে আমি হাঁটবো।

আগুর পক্ষে ফিরার কোন উপায় নেই। বল্লে ঃ হাঁটবে হাঁটো।

গর্তের ভিতরে পা পড়া মাত্রই অঙ্গারগুলি যেন বোকা বামুনের পায়ের পাতাকে ছেঁকে ধর্লে। তারপর কয়েকটা লাফ। আগু তবুও তাকে পার করে আনতে পার্লে। চট্টরাজ প্রায় সংজ্ঞাহীন। খেলার সমাপ্তি ঘন্টি বাজিয়ে দেওয়া হলো। চট্টরাজকে কাঁধে করে তার কামরায় নিয়ে আমরা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। অঙ্গার তখনও পায়ের পাতা ছেঁকে রয়েছে। আর, পায়ের চামড়া পোড়া গন্ধ উঠছে। ডাক্তারেরা তাকে নিয়ে পড়লেন।

আর, আগুর ক্ষোভ! 'বেকুব আর গাছে ধরে ! যাদুকরের কি কোন অলৌকিক শক্তি আছে ? দ্রব্যগুণ দিয়েই তার সব কাজ। আগুনকে কখনও ঘুম পাড়ানো সম্ভব ? আর হাঁটতে গেলি তো আগে গেলিনি কেন ? পাঠানদের সঙ্গে বেশ হাঁটিয়ে আনতুম। কূলে এনে আমাকে ডুবিয়ে দিলি! শিক্ষাটা তোর মনে থাকে যেন !'

www.pathagar.com

বিচিত্র অভিজ্ঞতা

মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আমার একই তাঁবুর একই শয্যার পাশের লোক পল্টনের সব চেয়ে দীর্ঘ পুরুষ গৌরী চক্রবর্তী অত্যন্ত ছোঁয়াছে ভীষণ সেরিব্রোস্পাইনেল মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হলো। এক দিনের জ্বরেই অন্ধ হয়ে সে বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে মরে গেল। তখন আমার শরীর বেশ ভাল। তারচেয়েও বড় কথা আমি একদম অভীত। কোন রকম ভয় পেলাম না।

অন্যান্য তাঁবুর আরও লোক দেখা গেল যারা তেমনি তাগড়া ও অভীত।

আর ওদিকে দলে দলে লোক সেই ভীষণ ব্যাধিতে শয্যাগত হচ্ছে যদিও আক্রমণ গৌরীর প্রথম আক্রমণের ন্যায় তেমন ভয়ানক নয়।

পল্টনে সব কাজই সৈন্যদের দিয়ে করানো হয়।

তখন আমাদেরকে নিযুক্ত করা হলো রোগীদের ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার কাজে।

ওদিকে আর এক বিপদ। জার্মেন সাব্‌মেরিন এমডেন ও কার্লস্রুর আক্রমণে রসদবাহী জাহাজের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

কিছু ডগ্ বিস্কিট রিজার্ভ ছিল। কুকুরে খায় এমন বিস্কুট। তবে এর গুণ হলো ভিজাতে পার্লে এগুলি ফুলে অনেক বেশী হয়ে যায়।

ফলে পল্টনে ভীষণ খাদ্যাভাব। তবে হাসপাতালে সরবরাহ কোন রূপে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

সৈন্যদের এমনি অভ্যাস যেখানে যা' পাওয়া যায় খুঁটে খাওয়া।

আমরা যে রোগী বয়ে হাসপাতালে যেতাম ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে খাদ্য খেতাম।

ডাষ্টবিন বলে যেখানে উচ্ছিষ্ট খাদ্য ফেলে সেই আস্তাকুঁড়কে।

আরেকটি বিচিত্র ঘটনা যখন মেসোপটেমিয়া এক্সপিডিশনারী ফোর্স-এর

www.pathagar.com

সর্বাধিনায়ক জেনারেল ষ্ট্যান্‌লী মড্ মারা গেলেন কলেরা রোগে। কারণ, সৈন্যদের পানির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সর্ব প্রযত্ন নেওয়া হয়, আর আমরা জানি যে পানি দূষিত না হলে কলেরা হতে পারে না। অথচ এখানে যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি মারা গেলেন কলেরা রোগে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে সেরিমোনিয়ে এসেছিল একটা বৃটিশ রেজিমেন্ট একদম ফায়ারিং লাইন থেকে। আর এসেই আমাদের আস্তাকুঁড় থেকে তারা উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খেতে লাগল। তবুও পরের দিন অন্ত্যেষ্টির সময় কেউ যদি তাদের প্যারেড দেখতেন— কী সুসংহত, কী সুন্দর তাদের প্যারেড!

www.pathagar.com

আজ্‌রাইলের মার

১৯১৭ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রথম বৎসর।

বৎসর শেষ না হতেই আজরাইলের ডানা শোঁ শোঁ করে ডেকে উঠল।

জার্মেন ডুবো জাহাজের উৎপাতে ভারত থেকে খাদ্য আসতে পাচ্ছে না। ওদিকে অভিযাত্রী বাহিনী এত জোর কদমে এগিয়ে গেছে যে লর্ড হার্ডিঞ্জের সরকার তাদের সরবরাহ-লাইন বজায় রাখতে পারেন নি। ফলে কূট-আল-আমারার যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বৃটিশ জেনারেল টাউন সেন্টকে সবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তুর্কীর নিকট।

ফায়ারিং লাইনে যুদ্ধরত বৃটিশ বাহিনীই খাদ্যের অভাবে নেতিয়ে পড়েছে। অন্যে পরে কা কথা।

এমন সময় প্রধান সেনাপতি জেনারেল এফ. এম মড্‌ই হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

আমাদের পল্টনে সব চেয়ে লম্বা সেপাই ছিল গৌরী চক্রবর্তী। আমার পাশের লোক বললেই হয়। হঠাৎ জ্বর হয়ে গৌরী মারা গেল।

মেডিক্যাল বোর্ড বসল। বোর্ড বললেঃ সর্বনাশ। এ যে সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস দেখছি- মস্তিষ্কের ও মেরুদণ্ডের ঝিল্লীর প্রদাহ। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই রোগী অন্ধ হয়ে যায়, জ্ঞান হারিয়ে শুধু হাতড়াতে থাকে, চল্লিশ ঘণ্টা না যেতেই মৃত্যু। যেমন ভয়ানক রোগ, তেমনই সংক্রামক।

প্যারেড উরেড বন্ধ হয়ে গেল। অন্য পল্টন এসে আমাদের ডিউটী বুঝে নিলে। আমাদের লোক মর্তে লাগল দলে দলে। আর, যারা ভাল আছি তাদের কাজ হলো আক্রান্ত ব্যক্তিকে ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে দিয়ে আসা।

বোর্ডের হুকুম হলোঃ সেগ্রিগেশন। যে সকল তাঁবুতে মেনিন জাইটিস ঢুকেছে সেগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে।

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নির্বাসিত করা হলো নদীর ধারে বিস্তীর্ণ এক খেজুর বাগানে। আমরা অনেকগুলো তাঁবু এসে পড়লুম-ব্যাটালিয়ানের এ বি সি ডী সব কোম্পানীর।

আমরা নাখুশী হলুম না। এই অরণ্য-বাসে কোন ডিউটী নেই। শুধু খাওয়া আর ঘুমানো। কয়েক জন ইন্ডিয়ান অফিসার জমাদার সুবেদারকে দেওয়া হলো আমাদের তদারক করার জন্যে।

ইতিমধ্যে আমার নানা নামে পরিচয় হয়েছিল। আলম, আলেম। কিন্তু আমার আসল নাম 'মাহবুব' উচ্চারণ করে কার সাধ্যি! তবে, কলকেতিয়া মুসলমানেরা (যেমন কাজী খালেক) ডাকতেন মাহবুব। পাকিস্তানী আমলে উর্দু-ভাষী বন্ধুরা বলতেন 'মেহ্‌বুব'। তবে সুরেশের দেখা-দেখি বেশীর ভাগ বন্ধুই ডাকতো 'মোবাইল'। পল্টনে 'মোবাইল কলাম' কাজটাও খুব চালু কথাটারও খুব চর্চা হয়।

'আর তোমরা মুসলমানেরা কেন এলে?' একটা প্রচ্ছন্ন দল ছিল। তাদের নেতা যে, তার ডাক-নাম ছিল বার্লিন। ছেলেটা ছিল খুব ঠোঁট-কাটা। মুসলমান মাত্রকেই (আমাকেও) সম্বোধন কতো 'চাচা' বা 'পাতি' বলে। 'পাতি' মানে 'পাতি নেড়ে'।

কিন্তু কিছু অন্তরঙ্গ পরিবেশও সৃষ্টি হচ্ছিল বাঁকুড়ার পঞ্চাননের আমার সঙ্গে 'বেই' (বেহাই) সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। সে আমাকে ডাকতো 'বেই' আমিও তাকে ডাকতুম 'বেই'।

একটা বিষয়ে আমার খুব উন্নতি হয়েছিল। কলকেতিয়া ভাষায় কথা বলার অভ্যাস। আমি প্রায় কলকেতিয়া হয়ে গিছলুম।

এর মধ্যে আমাদের তাঁবুতে কলকেতিয়া এক ছেলে ছিলঃ জিতেন ভট্‌চায। এমন হাসি-খুশি ছেলে আর দেখিনি। দুটি চোখ সব সময় রহস্যে ভরা। এই ছেলে আমার হাব-ভাব দেখে আশ্চর্য এক নামে আমাকে ডাকা শুরু কর্লেঃ ঠাকুরদা। শুধু ডাকা নয় ঠিক 'ঠাকুরদা'র ন্যায় আমার সঙ্গে ব্যবহার করতো, বায়না ধরতো।

নির্বাসনে এসে, সময় আর আমাদের কাটে না। শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাঁহাতক আর সময় কাটে! তাস, দাবা, এটা সেটা সব কিছুই চালিয়ে দেখা গেল। তবুও সময় ভারী হয়ে থেকে যায়।

এক রাত্রে শুয়েছি। জিতেন আমার পাশেই। ডেকে বল্ল ঃ ঠাকুরদা ? উত্তর কর্লুম ঃ কিরে ? বায়না এলো ঃ একটা গল্প বলো।

এত দিনে 'মুশকিল আসান' মিলে গেলো।

আমার বাবা ছিলেন সমাজ-পতি মানুষ। তখনকার সমাজ পতিরা অত্যন্ত পরার্থপর হতেন। বাবার একটা ধারণা ছিলঃ সকলের সব কাজই আমার কাজ।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত জীবন-রসিক। সব রকমের কাজেরই তিনি সন্ধান রাখতেন। তার মধ্যে একটা প্রধান ছিল গল্প বলার ক্ষমতা। জানা গল্প শুনতে ভাল লাগে না।

www.pathagar.com

বাবার বেলা এ নিয়ম খাটতো না। তিনি এমনভাবে গল্প বলতেন যে সেটা প্রত্যেক বারেই নূতন হয়ে উঠতো। শ্রোতা বুঝে তাকে আনন্দ দিয়ে গল্প বলার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আর সেটা আমাদের অঞ্চলে সুবিদিত ছিল।

একবার বড় এক বিয়েতে নাচ-গানের আয়োজন ছিল। বাবা সব কিছুর তদারক কচ্ছিলেন। এই মজলিসে আসতেই অধিকারী তাঁকে নিবেদন কর্লো যে নাচিয়ে গাইয়েরা নেচে গেয়ে হয়রান, এখন তাদের খাওয়ার আর বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু গুণ্ডারা কিছুতেই তাদের নাচ-গান থামাতে দেবে না।

বাবা বল্লেন ঃ আমি ব্যবস্থা কচ্ছি।

দর্শক-শ্রোতাদের সম্বোধন করে বল্লেন ঃ তোমরা নাচ গান দেখতে এসেছো, কিন্তুএরা অনেকক্ষণ ধরে নেচে গেয়ে খুব হয়রান হয়ে গেছে। এদের একটু বিরাম দেওয়ার দরকার। তা, আমি তোমাদের গল্প বলি। এরাও আসরে রইলো। পাঁচ মিনিট গল্প শুনে তোমরা যদি আরও শুনতে চাও গল্পই চলবে, সে অবসরে এরা খেয়ে বিশ্রাম করে আসবে। আর যদি গল্প ভাল না লাগে, কোন কথা নেই এদের বাধ্য হয়েই নাচ-গান চালিয়ে যেতে হবে।

মজলিসে তেমন লোক বেশী ছিল যাদের পরিচয় ছিল বাবার গানের যাদুর সাথে। সুতরাং, ঠিক হলো ঃ গল্পই শুরু হোক।

বাবা তাদের এমন জগতে নিয়ে গেলেন যেখান থেকে আর ফেরা নেই। গল্পের জাল বুনে তিনি শুধু এগিয়ে চলেছেন আর শ্রোতারা হা করে শুনছে। নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। নাচিয়ে গাইয়েরা খেয়ে ঘুম দিয়ে চাঙ্গা হয়ে আসল। তাদের বিষয়ে কারুর আর খেয়াল নেই।

আমি সেই বাপের ছেলে। অনেক গল্প আমার জানা ছিল। ছোট ভাইবোনদের বলতে গিয়ে আমি অনেক গল্প নিজেই বানিয়ে নিতুম।

যখন যুদ্ধে চলে আসছি তখন পাড়ায় একটা বিপরীত স্রোত চলছে। সাধারণতঃ নানী-দাদীরাই গল্প বলে থাকেন। কিন্তু তখন দাদী-নানীরাই দল বেঁধে আসতেন আমার গল্প শোনার জন্যে।

আমি গল্প শুরু কর্লুম।

গল্প শোনার আগ্রহ সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। গল্পের মাধ্যমে আমাদের অফিসার সেপাই সিনিয়র জুনিয়র ভেদাভেদ উঠে গিয়ে এক নতুন ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠতে লাগল।

রাত্রে কারো চোখে ঘুম নেই। আমি গল্প বলছি আর সকলে কান পেতে শুনছে। দিনের বেলায় তারা আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায়। 'তোমার পেটে এত গল্প' ঃ তাদের পরম বিস্ময় ঃ এত তোমার মনে থাকে কিরূপে?

আসলে কিছুই আমাকে মনে রাখতে হতো না। অনেক গল্পই আমার জানা ছিল।

www.pathagar.com

সেগুলোকে গল্প বলার সাথে সাথে আমি এমন সুকৌশলে বুনে নিতুম যে শাহারজাদীর গল্পের ন্যায় আমার গল্প কখনও শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না।

আর সব কিছুর মধ্যে বুক ফুলিয়ে চলতে লাগল জিতেন। আমার ঠাকুরদা! আমার ঠাকুরদা!!

গল্পের খবর জানাজানি হয়ে গেল মূল ব্যাটেলিয়ান পর্যন্ত।

মেডিক্যাল বোর্ড বল্লেন ঃ তাঁবুগুলোর ফ্ল্যাপ (দেওয়াল) গুটিয়ে রাখতে হবে, রাত দিন তার ভেতরে হাওয়া খেলুক। রাত্রে কেউ তাঁবুর ভেতর শোবে না। শুতে হবে আরবের অনন্ত বিস্তার মরুভূমির মাঠে।

আজরাইলের ডানার আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। তিনি বাঙ্গালী পল্টনকে ছেড়ে আর কোথাও হয়ত ঃ ডিউটী দিতে চলে গেছেন।

আমাদের নির্বাসন শেষ হলো। আমরা ব্যাটালিয়নে চলে আসলুম। রাত্রে মাহবুব-উল আলমকে কেন্দ্র করে মরুভূমিতে বিছানা পাতার কাড়াকাড়ি। সেই কেন্দ্র থেকে সবদিকে পড়ে বিছানার লাইন। আর সারা রাত গল্প চলে।

www.pathagar.com

উল্টো মহারাজ

আমাদের ছিল পল্টনের শেষ (ডি)কোম্পানীর শেষ (১৬তম) প্লেটুনের শেষ (চার) সেকশন। সেকশনে জমা ১৬ সৈন্য, একজন সেকশন কমাণ্ডার। আমাদের সেকশন-কমাণ্ডার ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। খুব সিনিয়র লোক, পল্টনে তাঁর ক্রমিক নম্বর ছিল ৯। কি করে পল্টনে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল উল্টো মহারাজ। অনেকের অনেক রকম নাম হয়েছিল। এই নামটা ছিল আদরের।

চেহারায় তিনি ছিলেন অসুন্দর, গাল দুটো পোটকা, দাঁতের উপরের পাটি কিছু পরিমাণে নীচের ওঠের উপর চড়া। কিন্তু, ব্যবহার ছিল এক দিকে কড়া, অন্য দিকে অত্যন্ত হৃদ্য।

কলিকাতায় এই ব্রাহ্মণ পরিবার নাকি শুঁড়িখানার মালিক। সুতরাং অবস্থা খুব ভালই।

সেকশন কমাণ্ডারদের জন্যে আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। সেপাইদের সঙ্গে এক সাথে শুতে খেতে হয়।

আমার আর তাঁর বিছানা ছিল পাশাপাশি। প্রথম দিকে তাঁর বাড়ি থেকে আনা টাকা-কড়ি ছিল। রাত্রে কিভাবে যে শুতেন তাঁর মানি-ব্যাগ খুলে গিয়ে টাকা-কড়ি তাঁর বিছানায় এবং আমার বিছানায় ছড়িয়ে পড়তো। সকালে উঠেই তিনি ডেকে বলতেন : ওরে ছোঁড়া, একটু কুড়িয়ে দে।

তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কলিকাতার এমন এক জন বখাটে ছিল যে গাঁজা খায়, লোক ঠকায়—আমার থেকেই দশ টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গিছল। ধরা পড়লে এবং আটকে গেলে সে বলতো 'প্রাণ কিষ্টের কাছে আমার টাকা আছে'। এ যে মিথ্যে আমরা বুঝতাম। কিন্তু উল্টো মহারাজ এক দিকে তাকে খুব বকা-ঝকা কর্তেন, অন্য দিকে তার যত দায়-দেনা পরিশোধ করে দিতেন।

উল্টো মহারাজের তাঁবুতে খুব রগড় চলতো। রাত্রে শুয়ে পড়বো এমন সময় জ্যোতিষ ছোট ছেলের ন্যায় কাঁদা শুরু কর্লে। মহারাজ ধাতানি দিলেন ঃ হেই জতে

www.pathagar.com

কাঁদছিস কেন ? আর জতে আবদারের সুরে বল্ল ঃ আমি বৌ-দির সাথে শোব। মহারাজ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ঃ এত বড় ধাড়ি ছেলে বৌ-দির সাথে শুবি কি রকম ? জতে কি ওতে থামে! গলা একদম সপ্তমে চড়িয়ে সে বায়না চালাতে লাগল ঃ আমি বৌ-দির সাথে শোব। মহারাজের তর্জন-গর্জনে চলতে লাগল ঃ মারবো এক থাপ্পড়!

আর অন্যান্য তাঁবুর বন্ধুরা এসে জড়ো হলেন। এর মধ্যে ল্যান্স-নায়ক চন্দ্রহাসও আছেন। বয়স্ক লোক। বৌ ছেলেপুলে আছে। একদিন রাগের মাথায় দুত্তোর' বলে চলে এসেছিলেন, এখন দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা কচ্ছেন। আমরা মাখি দামী দামী কেশ-তৈল। চন্দ্রহাস অনেক কোশেশ করে নারিকেল তৈল আনিয়ে নিয়েছেন, তা'ই মাখেন। বল্লেন: তোদের বৌ-দির যেন গন্ধ পাই।

পল্টনে এসে পড়েছেন সত্য নারায়ণ সিং, চুল-পাকা, কিন্তু ডন-খেলা শরীর। যখনই সময় জুটে অনেকগুলো ডন দেন। সঙ্গে এক ঘটি, আর এক গীতা। সময় করে স্নান সেরে আসন বানিয়ে গীতা পাঠ করতে বসেন। বাড়ি বিহার। ইয়েক্‌মা রেল স্টেশন।

আমার বড় লোভ হলো। সিংজীর সঙ্গে আমার কোন হৃদ্যতা গড়ে উঠেনি। জিতেনকে দিয়ে বলালুম গীতাখানি যেন একবার দেন,পড়ে দেখব।

ব্রাহ্মণ ফোঁস করে উঠলেন ঃ মুসলমানের হাতে গীতা দেব কেন? জিতেন গেল রেগে। তাঁবুর সকলেই যেন অসন্তুষ্ট হলো, একটা থমথমে ভাব চল্লো কিছু দিন। আমি ব্যাপারটা ভুলে গেলুম।

কিন্তু মানুষ কতক্ষণ শুধু নিজেকে নিয়ে-নিজেকে আর দেবতাকে নিয়ে থাকতে পারে! মানুষের মাঝেই মানুষের মুক্তি।

তাঁর এই একাকীত্ব প্রাণে বড় বাজতো। আমি ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলুম। যুদ্ধের কাজে একজন দোসর না হলে প্রাণ বাঁচে না। আমি দেখলুম যে তাঁর কোন দোসর নেই। অথচ আমার অনেক দোসর। আমি নিজেকে আরোপ না করে নিজেকে তাঁর কাজে লাগাতে লাগলুম।

ফল হলো আশ্চর্য্য। তিনি যেন আমার হাত ধরে তাঁর একাকীত্বের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তারপর এমন অবস্থা হলো ঃ আমাকে দেখলেই বৃদ্ধের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতো এবং তিনি ক্রমেই আমার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন। এমন কি আমি বলে না দিলে খাওয়া পরা সম্বন্ধেও তাঁর কোন হুঁশ থাকতো না। আমাকে ডাকতেন 'বেটা' হিন্দীই ছিল তাঁর জবান। তবে বাঙ্গালায়ও অভ্যস্ত ছিলেন।

১৯১৯ সালের ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-বিরতি হয়ে যায়। আর্মি জীবন শেষ হয়ে গেল। বাঙ্গালীর আসল হাত মসী-জীবনে কর্তৃপক্ষ এটা জানতেন। আমাদের মসী-জীবন

www.pathagar.com

লুফে নিলেন। ৮ ইণ্ডিয়ান জেনারেল হাসপাতালে সামান্য অভিজ্ঞতার পর আমি গিয়ে বসলুম মেকিনার সুবৃহৎ বেইস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোর্সের রিপেয়ারেবল সেকশনের হেড ক্লার্ক হয়ে।

ইতিমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছিল।

বৃটিশ সিপাহী-বিদ্রোহ দমন কর্তে পেরেছিলেন শিখদের সাহায্যে। সিপাহী বিদ্রোহে বৃটিশের দিক থেকে সবচেয়ে শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল যখন কানপুরের বিবিঘরে ১৫-১৭ জুন নানা সাহেবের দল কিছু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ রমনী ও শিশুকে হত্যা করে। বিগ্রেডিয়ার-জেনারেল নীল এর দাদ নেন ওদের রক্ত-মাখা মেঝেকে রেখে দিয়ে এবং সন্দেহ বশে ধৃত ভারতীয়দের জিহ্বা দিয়ে চেটে সেই রক্ত পরিষ্কার কর্তে বাধ্য করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হলো শিখদের প্রধান স্থান অমৃতসরে। এখানে জেনারেল ডায়ার ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল একটা নিরস্ত্র জনতাকে শায়েস্তা করার জন্যে নিষ্ক্রমণের এক মাত্র পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদের উপর ট্যাংক থেকে গুলি চালান। ফলে ৩৭৯ জন নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়। প্রাদেশিক সরকার এর অনুমোদন করে 'গোদের উপর বিষ ফোঁড়া'র ন্যায় সামরিক আইন জারী করেন। জনতা বৃটিশ মিশনারী মিস শেরউডকে প্রহার করে অচৈতন্য করে ফেলে দিয়েছিল। সামরিক শাসক আদেশ দেন যে কোন ভারতীয় হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া সোজা হেঁটে এই স্থান অতিক্রম কর্তে পার্বে না।

এতে শিখদের মধ্যেও বৃটিশ বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ বৎসরের বালক উধম সিং প্রতিহিংসার যে শপথ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ সময়ের গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ারকে লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে গুলি করে মারে এবং ফাঁসী কাঠে প্রাণ দেয়। আমরা তখনও ৮ ইণ্ডিয়ান জেনারেল হাসপাতালে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং সামরিক শাসনের সব ভয়াবহ খবর আমাদের নিকট পৌঁছে গেল। আর দল-মত নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-শিখ বিচার না করে সব ভারতীয় ক্রোধ ও ক্ষোভে লিপ্ত হয়ে উঠল।

৮ ইণ্ডিয়ান জেনারেল হাসপাতাল অতি-বৃহৎ এক প্রতিষ্ঠান। কত দেশের কত রকম লোক যে এতে কাজ করে। সব চেয়ে লক্ষ্যযোগ্য ইণ্ডিয়ান আর্মির পেনশনভোগী পুরনো হাবিলদারদের যাদের বুক-ভরা মেডাল, স্মৃতি-ভরা অতীতের কত না যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপদ-কালে মদদের জন্যে যাদের আবার অসামরিক চাকুরিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

আরও একটা বিপদ যাচ্ছিল। হাসপাতালের অফিসার কমাণ্ডিং হলেন কর্নেল ডস। ইনি কি কারণে রেগে গিয়ে হাতের ছড়ি দিয়ে এরকম একজন হাবিলদারকে আঘাত করেন। শেতাঙ্গ তো এত কম, আঙ্গুলে গোনা যায়। এই ঘটনায় কৃষ্ণাঙ্গদের এমন বিক্ষোভ লেগে যায় কর্নেল ভয় পেয়ে হাবিলদারের নিকট মাফ চেয়ে এ যাত্রা

www.pathagar.com

কোন রকমে বিপদ কাটালেন। তার উপর জালিয়ানওয়ালাবাগের এই দুঃসংবাদ।

মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে এমন বহু বৃটিশারের সাথে আমাদের কাজ কর্তে হচ্ছে যারা কখনও ভারত দেখেনি, ইংরেজী ছাড়া যারা দুনিয়ার আর কোন ভাষা জানে না।

এদের কোরাণ হলো একটা ধর্মীয় সভা হচ্ছে। তারপর একজন মিসরীয় আলেমকে সভাপতি করে (ভাওতা দেওয়ার জন্য) ভারতীয়দের এমন সব বক্তৃতা হলো যেগুলোকে বলা চলে আগুনের ফুলকি-সবই বৃটিশের বিরুদ্ধে। এরপর আমি বেস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোর্সে চলে যাই। এখানে আমার অসাধারণ ক্ষমতা। ষ্টোর্সের যে কোন মাল আমি যে কাউকে দিতে পারি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সব মাল ফেরৎ হয় আমার নিকট। আমিই তার হিসেব তৈরী করে যেটা যেখানে পাঠাবার পাঠিয়ে দেই। সিংজীও কোথাও কাজ কচ্ছিলেন।

হঠাৎ আমার কাছে গোপনে খবর পাঠালেন ঃ প্রকাশেরা বোমা বানানো ঠিক করেছে-ইংরেজকে তাড়ানোর জন্য। সব উপকরণ নেবে তোমার থেকে। তুমি দিয়ে বসোনা যেন।

প্রকাশ চক্রবর্তী কলকাতার ছেলে। পল্টনে এক নম্বর মল্লা। যেমন গায়ে জোর, তেমন তার দম, তেমন প্যাঁচের কৌশল। লড়ে যখন, তখন তার শরীর থেকে এক রকম জানোয়ারের ন্যায় আওয়াজ বেরোয়। ফুর্তি হয় ভীষণ। পরের দিন দল নিয়ে প্রকাশ হাজির। আমার সঙ্গে তার দোস্তিও আছে। কিন্তু আমি বোমা বানানোর সাহায্য কর্তে রাজী হলুম না। বল্লুম ঃ একবার বোমা ছোঁড়ো, তারপর পালিয়ে বেড়াও সেটা আমার দ্বারা হবে না। তবে, বন্দুক নিয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ কর্তে আমি রাজী আছি, তাতে ইংরেজই মরুক কি নিজেই মরি।

ওরা হতাশ হয়ে চলে গেল।

শেষ যাত্রা হলো বাড়ি মুখো, ট্রেনে করাচী থেকে। সিংজী আর আমি এক সাথে। বুড়োর কিছুতেই আর গা নেই। বল্লেন ঃ তোমরা যা ইচ্ছা কিনে খাও। আমাকেও দেবে। তুমি যা খাবে আমি তাই খাবো। সারা পথ তাঁর দুটো চোখ কেঁদেই চলেছে।

ইয়েকমা ষ্টেশনে নেমে গেলেন না। আমরা নৈহাটী এসে পড়লুম। চট্টগ্রামের ট্রেনের অনেক দেরী। দুজনে খুব এক চোট ঘুমিয়ে নিলুম। ঘুম থেকে উঠে কিছু খেলুম। বুড়োকে জোর করে ইয়েকমার গাড়িতে তুলে দিলুম। চোখ মুছতে মুছতে তাও মানলেন। শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়েই আমার সঙ্গে ভিন্ন মত হতেন না।

বাড়ী এসে দেখি রেশন-টিন (যেটায় করে সৈন্যরা-খায়) বদল হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে চলে গেছে আমার রেশন-টিন। আমার সঙ্গে চলে এসেছে তাঁর রেশন-টিন। বুড়ো কি এখনও কাঁদছেন।

www.pathagar.com

দোসর

পল্টন এমন লাইন যেখানে একজন দোসর না হলে চলে না।

আমারও একজন দোসর জুটেছিল ঃ নারায়ণ চক্রবর্তী। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের ছেলে। কাল রং, গোঁফ জোড়া দেখবার মত, দুই চোখে এক রাজ্যের মায়া, গানের গলা শুনে থাকতে ইচ্ছে করে।

অতি সরল মধুর স্বভাবের লোক, কোন কোন খেলায়ও ওস্তাদ, আমার সঙ্গে নিবিড় সখ্য জমে গেল।

সখা বলে কাকে ? দুজনে সামনা-সামনি বসে ভাবছি, চুপ-চাপ। হঠাৎ নারাণ বল্লে ঃ তুই কি ভাবছিস বলবো ?

আশ্চর্য ! যখন বলতো ঠিক ঠিক মিলে যেতো। আমি তার ভাবনার কথা বলতে পার্তুম।

নারাণ যেন আমাকে কতকটা শ্রদ্ধাও করতো। সে তেমন লেখা-পড়া জানতোনা। শ্রদ্ধা আমার লেখা-পড়ার প্রতি।

আমি তার উপর জুলুমও কম কর্তুম না। যেমন সৈন্যদের বন্দুক সাফ করার জন্যে নেকড়ার খুব প্রয়োজন হয়। নেকড়া যোগাড় করে রাখতে হয়, ময়লা হয়ে গেলে কেচে দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে যত্ন করে তুলে রাখতে হয়।

কিন্তু, এই গিন্নীপনা ? আমার ধাতে সইতোনা। কাজ সারার সাথে সাথে আমার নেকড়া বেমালুম হারিয়ে যেতো।

আমার কাজ ছিল প্রতি বারে নারায়ণের নিকট হাত পাতা। বলতুম ঃ হাঁরে নারাণ, তোর কাছে নেকড়া আছে ?

নারাণ হাসি-চোখে নেকড়া বের কর্তো। বলতো ঃ তিন সত্যি কর। বল ঃ যাকে রাখি সে-ই রাখে। আমাকেও মুখে মুখে আওড়াতে হতো ঃ যাকে রাখি, সে-ই রাখে। তিনবার মুখে মুখে আওড়ানোর পর নারাণ নেকড়া হাতে দিত।

www.pathagar.com

আমার যেমন কোন দিন নেকড়া থাকতোনা নারাণরও কোন দিন তার অভাব হতোনা।

সখার কাজ হলো সখার পাশে পাশে থাকা। তার চরিত্রে যেটার অভাব হয় নিজের চরিত্রে দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেওয়া। নারাণ লক্ষ্য রাখতো কোথায় আমি কি ফেলছি সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার জন্যে উপযোগী করে রাখতো। আমাকে ওস্তাদ বানানোর জন্যে তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

প্রথমত ঃ তাস-খেলা। সময় হরণের জন্যে পাইকারী এমন জিনিস আর নেই। বন্ধুরা আমাকে তাস-খেলায় বসাতো। আমার হাত নাকি এতো ভালো আসতো যে অনেকের ভাগ্যে ওরকম জোটেনা। কিন্তু, খেলায় আমার মন থাকতোনা। হেরে গেলে আমার লজ্জা হতো না, আর নেশাকে আমি ভয় কর্তুম। মনে হতো, আমি যেন আমার জীবন থেকে সরে যাচ্ছি। তবুও ধীরে ধীরে নেশা ধরতে লাগলো। তার হাত থাকে বাঁচার জন্য একদিন চাকু দিয়ে বাম হাতের তর্জনী প্রথম কর-রেখা দোফালা করে ফেল্লুম। সামান্য রক্ত পাত হলো। কিন্তু বন্ধুদের অজুহাত দেওয়ার একটা সুযোগ হয়ে গেল।

বিষ্ণুপুরের দুই জিনিস বিখ্যাত ঃ তামাক আর দাবারু। নারাণ তেমন এক দাবারু। বলতো, বিষ্ণুপুরে ছক দেখে দাবা খেলে না। ওতো শিশুতেও পারে। বিষ্ণুপুরে দাবারু হুঁকা মুখে দাওয়ায় বসে থাকে। ছক থাকে ঘরের ভেতর। একজন ভেতর থেকে তাকে পজিশন বলে দেয় আর দাবারু ছক না দেখেই চাল বাৎলায়। এভাবেই খেলা চলতে থাকে।

তার অতি বড় সাধ ছিল আমাকে দাবায় পোক্ত করে তুলবে। কিন্তু, আমি নৌকা নিয়ে চল্লাম তো নৌকা নিয়েই পাড়ি জমালুম। নারায়ণ কপাল কুঁচকে বলতো ঃ ওকি হচ্ছে! আমি বলতুম ঃ নৌকা থেকে নামব কেন ? তুই তো জানিস না। দুনিয়ায় আমাদের দেশের মতো নদী-নালা কোথাও নেই। নৌকায় থেকে আকবর বাদশার তুরক-সওয়ারকে (তুর্কী অশ্বারোহী-বাহিনীকে) পর্যন্ত আমাদের বার-ভুঞারা সাফ করে দিয়েছিল।

আবার যেদিন গজ নিয়ে চললাম তো গজ নিয়েই চল্লাম। নারায়ণ বলতো ঃ আরে মলো, ওকি কচ্ছিস ? আমি বলতুম ঃ জানিস তো না, গজ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাহন। চণ্ডাশোক শ্রেষ্ঠ বাহনে এসেছিলেন বলেই রাজত্ব পেয়ে গিছলেন। ইতিহাসে লেখা আছে।

নারায়ণের মুখে আসতো, তোর কিচ্ছুই হবে না। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলতো না। শুধু দু'চোখ দিয়ে হাসতো।

এর অনেক পরে ১৯৫১ সালে আমি তখন খুলনার জেলা সাব-রেজিষ্ট্রার। ডিপার্টমেন্টের কাজে কয়েক দিনের জন্যে আমাকে ঢাকা আসতে হলো। এক বন্ধু এ

www.pathagar.com

এফ এম আবদুল হকের সঙ্গে ব্যবস্থা হলো তিনি আমার টাইপের যত কাজ তাঁর ষ্টেনোকে দিয়ে (তিনি তখন এ-ডি-পি-আই) করিয়ে দেবেন আর প্রতিদিন আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবেন। আর এক বন্ধু ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে ব্যবস্থা হলো আমার স্ট্যাটিসটিকসের যত কাজ তিনি মিলিয়ে দেবেন আর যেদিন কার্জ্জন হলে তাঁর কাছে যাই তিনি আমাকে ডিনার খাওয়াবেন।

একবার তো ডিনার খেয়ে আমরা উঠলুম। তিনি তাড়াতাড়ি একটা পুঁটুলী নিয়ে এলেন। ভাবলুম পান বুঝি। বল্লুম ঃ খাই না যে। তিনি বের কর্লেন দাবার ছক। আমি বল্লুম ঃ জানা নেই। তিনি বল্লেন ঃ জানতে হবে না, শিখিয়ে দেব। অনেক কষ্টে তাঁর হাত থেকে বাঁচলুম।

এর পরও ১৯৬০ সালে কবাচীতে রাইটার্স গীল্ড যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ও আমি পড়লুম হোটেল দ্য লাক্সের একই কামরায়। পাশের কামরায় অন্যান্য বন্ধুরা আছেন।

তত দিনে ..... আমি তাঁকে বল্লুম, আমি এক কানে শুনিনে। তিনি বল্লেন, আমি দুই কানেই শুনিনে। সেবার হাসির গল্পের একটা মেজাজ এসে গিয়েছিল। আমাদের কামরায় এসে জুটেছিলেন বন্ধু ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং খাঁ বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ। গল্প শুনে সকলে হেসে লুটোপুটি।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এই সখ্যের আরও গভীর দিক রয়েছে।

আপনি এমন ডিউটী থেকে ফিরলেন যেখানে জল-কাদায় আপনার বুট নষ্ট হয়ে গিয়েছে-পলিশ তো নাই-ই। অথচ, এমন চকচকে পলিশ থাকা চাই যাতে মুখ দেখা যায়। না হলে, নম্বর টুকবেন, তার মানেই শাস্তি।

কিন্তু, ফিরে এসে জুৎ করে বসতে পারেন নি, তখনি আবার ডাক পড়লো নতুন ডিউটীর জন্যে 'ফল ইন' কর্তে হবে। আপনার বুট নিয়ম মাফিক চকচকে থাকতে হবে। এ কথা বল্লে চলবেনা যে আমি তো এইমাত্র ডিউটী থেকে ফিরলাম।

কারণ আপনার মূল শিক্ষা হলো দুটি ॥ পহেলে তো হুকুম মান্না। কোন অজুহাত শোনা হবে না। দোসরে তো সিপাহী কা সাফায়ী—একদম নিখুৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

এখানে রয়েছে সখার ভূমিকা। সে তার নিজের পালিশ করা বুট আপনাকে দিয়ে দেবে, আপনার ময়লা বুট নিয়ে নেবে পরিষ্কার করে রাখার জন্যে।

পাঁচ মিনিটের ফুরসৎ পেলেও আপনি আগে চলেন স্নান কর্তে। নয়তো আপনি বাঁচবেন না। আপনি স্নান করে নিলেন। ভিজে কাপড়-পচাপড় স্নানের জায়গাতেই ফেলে আসলেন। সখা এসব কেচে নিয়ে ইস্ত্রী করে রাখবে। সৈন্যরা কম্বল চাপা দিয়ে খাকী কাপড়ের চমৎকার ইস্ত্রী করতে শিখে।

লঙ্গরখানা থেকে আপনার খাবার নিয়ে আসার সময় নেই। সখা আপনার রেশন-

www.pathagar.com

টিন নিয়ে গিয়ে খাবার ভরে-আপনার হেভারসেকে ঢুকিয়ে দেবে।

স্নান সেরে এসে আপনি শুধু দাঁড়ালেন। সখা আপনাকে পোশাক পরিয়ে বুটের ফিতাপট্টী বেঁধে দিয়ে চিন-ষ্ট্রেপ এ'টে দিয়ে আপনাকে সাজিয়ে দেবে।

এর চেয়েও গুরুতর দিক আছে। সেটা যদি কখনও হাতাহাতি যুদ্ধ বেধে যায়। সখা আপনার পাশে থেকে আপনাকে বাঁচাবার জন্যে সিংহের ন্যায় যুদ্ধ কর্বে, বিনা দ্বিধায় আপনার জন্য প্রাণ দেবে।

বেসামরিক ও সামরিকে, শান্তি-ক্ষেত্রে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে পার্থক্য এখানে। বেসামরিক ও শান্তির ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের দৌড় টাকা ধার দেওয়া পর্যন্ত। এখানে প্রাণ হলো সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। কিন্তু, সামরিক ও যুদ্ধ-ক্ষেত্রের মেজাজই এই যে লোকে প্রাণ হাতে করে ফেরে। প্রথম ডাকেই তাকে ডালি দিয়ে দেয়। অনেক সময় একটা রুটির মূল্য অনেক বেশী হয়ে দাঁড়ায়। মরো আর মারোই যেখানে নীতি সেখানে এই আমেজ রপ্ত করে নিতে কোন সিপাহীরই দেরী হয় না।

কি করে জানিনা আমাদের একটা ছোট দলের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল—আমরা সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট দেশে ফিরে যাবো না-একটা অসাম্প্রদায়িক নতুন সমাজ গঠন কর্বো। কিরূপে বলতে পারিনা এই দলটির আমিই নেতা হয়ে গিয়েছিলুম। আমার প্রধান শাগরেদ ছিল নারাণ। যেহেতু আমি বলছি সে এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস কর্তো। পল্টনের পরিবেশে দাঁড়িয়ে এটা অসম্ভব মনে হতো না। তার মধ্যে একজন প্রধান ছিল হাবিলদার মণি।

কিন্তু, এমন যে সখা নারাণ, যেদিন আমি কুর্দিস্তান অভিযানে রওয়ানা হলুম সে তখন সঙ্গে যেতে পার্লোনা। কারণ সে ছিল হাসপাতালে। আমি তাকে হাসপাতালে দেখতে গেলুম। অভিযানে সঙ্গী হতে পার্লোনা বলে তার সেকী আহাজারী।

নারাণ শুধু বলতো ঃ দেশে ফিরে গেলে একবার বিষ্ণুপুরের তামাক আমি নিজে সেজে তোকে দেবো। তুই কি করে না খেয়ে পারিস আমি দেখবো।

তেমনি আর এক বন্ধু হরিনারায়ণ বলতো আম খেতে হয় একবার আমাদের বাড়ি আসিস, গাছ-পাকা আম খেতে কেমন দেখতে পাবি। তার বাড়ি ছিল মালদহ কি রাজশাহীতে।

আমার সংস্পর্শে যারা আসতো আমি সুযোগ বুঝে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী তাদের কাছে প্রচার কর্তুম।

কুর্দী অভিযানে গিয়ে অনেকগুলো ভারতীয় পল্টনের সাথে আমাদের কাজ হতে লাগলো। নানা পল্টনে নানা জনের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং খাতির জমে গেলো। সে খাতির এমন, যদি হাতাহাতি যুদ্ধ বেধে যেতো তারা আমার জন্যে জান দিতো—আগেই বলেছি যেটা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে খুব সহজ।

www.pathagar.com

আমার মনে হলো ঃ এবার প্রচার কার্যে আমি কিছু আগ্রাসনও কর্তে পারি।

অভিযান করে চমচমল পৌঁছে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে আমরা কিছু বিশ্রাম পেলুম। চমচমল দুর্গ তখন ঘাঁটি ছিল এক (যতটা মনে পড়ে) রাজপুত রেজিমেন্টের। আমি তাঁদের ওখানে ঢুকে পড়লুম।

তাঁরা আমাকে মৃগ চর্মে বসতে দিলেন। কোথা থেকে মৃগ চর্ম যোগাড় করেছিলেন বুঝতে পার্লুম না। আমার সামনে তাঁদের জনতা জমে গিয়েছিল। তাঁরা আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করলেন ঃ আভি বাংলাইয়ে হাম-লোগ কা তিলক কওন কওন হ্যায় ?

আমি বুঝতে পার্লুম ঃ তিলক মানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমি ভারতীয় আন্দোলনের নেতাদের পরিচয় দিতে লাগলুম।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যে কোন ভারতীয়কেই বৃটিশের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। ভারতীয় আন্দোলন তখনও স্বাধীনতা আন্দোলন হয়ে ওঠেনি। বৃটিশের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং কথা শোনা খুব ব্যাপক হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় পল্টনগুলোও এর থেকে বাদ পড়েনি।

বেসামরিক জীবনে ফিরে এসে 'শচীন্দ্র সান্যালের জীবন স্মৃতি' পড়ে আমি দেখতে পেলুম বিপ্লবীরাও লক্ষ্য স্থির করেছিলেন সৈন্য-বাহিনীর আনুগত্য ভাঙ্গিয়ে আনতে হবে। তবে, কাজটি খুব সহজ ছিল না।

বেসামরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন ১৯২২ সালে চকরিয়ায় কাজ কচ্ছি তখন নারাণের চিঠি পেলুম ঃ তুই হয়তো বিষ্ণুপুর চলে আয়, নতুবা আমাকে তোর কাছে নিয়ে যা। চার ধারে যে জীবন দেখছি সেটা আমার আর সহ্য হচ্ছেনা।

সেটাই আমাদের শেষ সংযোগ। তারপর ৫০ বৎসরের উপর কেটে গেছে। এখনও মনে হয় আমার যেন ব্যারাক জীবন চলছে, আর নারাণ সর্বক্ষণ পাশে আছে সখা রূপে।

আশ্চর্য। জীবনে যাদের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব হলো তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ততদিনে অন্নদা শঙ্কর রায়ের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছে। তিনিও ব্রাহ্মণ।

তাঁকে এর কারণ জিগ্যেস কর্লুম। তিনি বললেন তোমার ভেতরও এক ব্রাহ্মণ রয়েছে। এই কথাই মাঝে মাঝে ভাবি।

www.pathagar.com

গুর্খা সংবাদ

ইরাক ঃ ১৯১৭-১৯২১

চীফ ক্লার্কের নিজস্ব একজন আর্দালী থাকে। আমারও আছে।

তবে, প্রথম দিনই তার সাথে আমার দেখা হলো না।

বুড়া ফ্রান্সিসের কাজ চালাবার একটা ধারা হলো ঃ কাউকেও বসে থাকতে দেবেন না। কাজ না থাকে যেখানে কাজ আছে সেখানে গিয়ে খাট্‌তে হবে। কোন কোন সেকশনে হরদম কাজ চলছে। সেখানে খাটবার জন্যে আমাদের কর্মহীনদের পাঠিয়ে দিতেন।

আমার অর্দালীকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন সে এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো।

গুর্খা। তবে প্রায় গুর্খাই বেঁটে। খোদার খাসীর মত তাগড়া গোল-গাল চেহারা। এ লম্বাটে, চেহারায় এমন একটা বিশীর্ণতা আছে যেন বহু দিন পেট পুরে খেতে পায় না।

নাম বলল ঃ কমান সিং।

শীতকাল। ফ্রান্সিস সকাল সকাল এসেছিলেন। কারণ, কুকুর হেনরী পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে ফ্রান্সিসের বাংলো থেকে অফিসে এসে দেখা দিয়েছিল।

হেনরী একটা জার্মেন কুকুর। খুব ছোট খাটো। তবে, একবার পালাতে পার্লে তাকে ধর্তে পারে কোন বাপের বেটা।

ফ্রান্সিস কমান সিংকে হুকুম করলেন হেনরীকে ধরে আনতে।

শীতটা এত ঠাণ্ডা। পানি জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ব্রেজিয়ার জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে কাজ কচ্ছি। কেউ ঢুকলেই বলতে হয় ঃ শাট দি ডোর, দরজা বন্ধ করুন।

তেমন ঠাণ্ডায় কমান সিং ধাওয়া করল হেনরীর পেছনে।

৯ বেইস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোর মস্ত বড় এলাকা। গলি ঘুঁজি যে কত আছে আর

www.pathagar.com

সবই যেন হেনরীর নখ-দর্পণে। হেনরী সহজেই কমান সিংকে স্লিপ দিতে লাগল।

সাত চক্কর দেওয়ার পর কমান সিংয়ের হাত পা ফেটে রক্ত বেরুবার উপক্রম। তখন গুর্খার গেল মেজাজ খিচ্‌ড়ে। শালা, হামকো এৎনা তক্‌লিফ দেতা—বলে কমান সিং হেনরীর পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে দিলে। তারপর মুঠি বাগিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি অবস্থাটা বুঝতে পেরে ত্বরিত উঠে তার আগে গিয়ে সাহেব ও তার মাঝে এসে দাঁড়ালুম।

সাহেবের চোখে সন্দেহ ঘণীভূত হয়েছিল। আমাকে জিগ্যেস কর্লেন ঃ কি ব্যাপার?

আমি বেশ বড় বড় করে বল্লুম ঃ কমান সিং বলছে ঠাণ্ডায় তার হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু, বহু চক্কর দিয়েও হেনরীকে ধরা সম্ভব হয়নি। ক্ষুধা পেলে আপনিই সে ধরা দিতে পারে।

সাহেব বল্লেন ঃ তথাস্তু।

অন্য সেকশনে গিয়ে শ্রম দেওয়া আমাদের মীনিয়েলরা যেমন পছন্দ কচ্ছিলনা, ব্যাপারটা আমারও তেমন মনঃপুত ছিল না।

সুযোগ বুঝে আমি একবার ফ্রান্সিসকে বল্লুম ঃ এখানে প্রত্যেক সেকশনই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের মীনিয়েলদের অন্য সেকশনে খাটতে না পাঠিয়ে বরং যাতে তাদের মানের উন্নতি হয় আমরা সে ব্যবস্থা করতে পারি।

ফ্রান্সিস জিগ্যেস করলেন ঃ সেটা কি ভাবে সম্ভব?

আমি বল্লুম ঃ আমরা তাদের কিছু লেখা-পড়া শিখাতে পারি।

ফ্রান্সিস এবার প্রশ্ন করে বসলেন ঃ শেখাবে কে?

আমি বল্লুম ঃ আমি শেখাতে পারি।

ফ্রান্সিস বল্লেন ঃ আমার আপত্তি নেই।

আমি অমনি যুদ্ধ ফেরৎ সামানা থেকে কয়েকখানা টেবিল বানিয়ে নিলুম। শিখ টেহল সিং ছিল আমাদের সেকশনের সুতার মিস্ত্রী। তাকে দিয়ে এসব কাজ করাতে কোন অসুবিধেই হলো না। ড্রাম উল্টে টুল বানানো হলো। নূতন ব্যবস্থা মীনিয়েলদের জানাতেই একটা মুক্তির আনন্দ যেন তাদের পেয়ে বসল।

সব চেয়ে খুশী হলো কমান সিং। সাহেব-প্রহার থেকে উদ্ধার করায় সে আগেই আমার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। এখন নূতন ব্যবস্থায় তার নিজস্ব একটা কোণে বসে লিখা-পড়া করা তার নিকট অত্যন্ত গৌরবজনক মনে হতে লাগল।

গুর্খাদের সাথে বাঙ্গালীদের চেহারা-সুরতে কিছু মিল আছে। এমন কি তাদের হিন্দী-ভাষণও বাংলা-ভাষণের মত শোনায়।

www.pathagar.com

কমান সিং প্রায়ই বলতোঃ বাবুজি, তোমরা ওয়াস্তে জরুর হোয়গা, হাম জান দেগা।

গুর্খা এই জান দেওয়াটাই ভাল বোঝে। মনিবের সঙ্গে তার নিকটতম এবং নিবিড়তম সম্পর্ক এইখানেই। তার আছে একটা পশু-মন, প্রভুভক্ত কুকুরের মত।

নাপিতকে ডেকে আনঃ কমান সিংকে যদি হুকুম করি—সে যেই অবস্থাতেই থাকুক-গোছলের মাঝখানে, খেতে বসার উদ্যোগে-কমান সিং তাকে ধরে নিয়ে আসবে। বলবেঃ চলো, চলো, বাবুনে বোলায়া। কোন কৈফিয়ৎই তাকে ঠেকাতে পার্বে না।

যুদ্ধের একটা ভয়াবহ চরম অবস্থা হলো যখন সামনা সামনি দুই পক্ষে বেয়নেট ফাইটিং হয়। তখন গুর্খার তুলনা হয় না।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ পরিখা যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত। গুর্খা যখন বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে বিপক্ষের ট্রেঞ্চে লাফিয়ে পড়তো চিৎকার করে-চোখ দুটো বাঘের চোখের মত জ্বলছে, দাঁতে কামড়ে ধরেছে কুক্‌রি-তখন তাকে দেখাতো সাক্ষাৎ রণ-দেবতার মতো। দুনিয়ায় এমন সৈন্য বাহিনী নেই যে এই দেবতার বীর্যের নিকট মাথা নত না করেছে।

কুক্‌রি তার শেষ অস্ত্র। গুর্খা যদি কুক্‌রি ছুঁড়ে মারে তার মার হবে অমোঘ ও নির্ঘাৎ।

গুর্খা বাহিনীর প্যারেডও এত নিখুঁত যে দেখে থাকতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু, গুর্খা নিজ দেশে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করে।

একবার বিমার হয়ে হাসপাতাল যেতে হয়েছিল। পাশের সীটে ছিল এক গুর্খা সৈন্য— বম বাহাদুর। এমন সুন্দর শিস দিত যে প্রাণ কেড়ে নিত।

বম বাহাদুরের অনেকগুলো বৌ। এক একটা যুদ্ধের পর বহু পুরুষ ফৌৎ হয়ে যায়। তখন মেয়ে অনেক বাড়তি হয়ে যায়। সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষের একাধিক বিবাহের রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

বম বাহাদুরকে জিগ্যেস করেছিলাম ঃ তবুও যুদ্ধে আস কেন? এতো তোমাদের যুদ্ধ নয়!

উত্তর করেছিলঃ বৃটিশের জরুর আর মহারাজার হুকুম—আমরা না এসে পারি। আর, দেশে থেকে খাবই বা কি!

জীবনে এদের কোন উদ্যোগ নেই।

বম বাহাদুর গল্প করেছিল ডালা-শিকারীর। অন্ধকার রাতে মাথার উপর ডালা নিয়ে— ডালার উপর প্রদীপ রেখে এরা বাঘের গহ্বরে চলে যায়—হাতে নিয়ে কুক্‌রি। বাঘের নজর থাকে প্রদীপের উপর। ডালার নীচের মানুষটিকে বাঘ দেখতে পায় না। এ ভাবে একেবারে কাছে গিয়ে শিকারী বাঘকে কুক্‌রি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

www.pathagar.com

তখন দেশে ডাক-ব্যবস্থাও ছিল না। তবে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছে, আবার দেশে ছু'টি শেষ করে কেউ আবার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছে তার মধ্য দিয়েই টাকাকড়ি খবরা খবর চলাচল কর্তো।

আমাদের প্যাকিং সেকশনে কাজ কর্তো শংকরী। বেঁটে, খোদার খাসী টাইপের গুর্খা। গোঁফ জোড়া সূচাল, দেখার মতো; কিন্তু, মেজাজ একেবারে পানি, এমন পোষ মানা প্রকৃতি সাধারণত ঃ দেখা যায় না।

সেই শংকরীই একদিন একেবারে পাগল হয়ে গেল। বাঁ হাতে পাথর, ডান হাতে কুক্‌রি-অনবরত ধার দিয়ে চলেছে- চোখ দুটো জ্বলছে, মুখে আওয়াজ 'উস্‌কা জান খা লেগা, উস্‌কা জান খা লেগা'। ব্যাপার কি, দেশ থেকে লোক এসেছে। খবরঃ তার বৌ এক জনের সাথে চলে গেছে।

শংকরীকে দিয়ে আর কাজ করানো সম্ভব হয় নি। ম্যাকইলওয়েন তখন তখনই তাকে ছুটি মঞ্জুর করে ইন্ডিয়ার জাহাজে তুলে দেন। সে কুক্‌রিতে ধার দিতে দিতেই জাহাজে গিয়ে উঠ্‌ল। তারপর কার জান কে খেল আর খবর পাওয়া যায় নি।

গুর্খারা আমাদের দেশেও নিয়োজিত হয়েছিল মাস্টার-দা সূর্য সেনের বিপ্লবীদের মুকাবিলা করার জন্যে। এই মুকাবিলায় গুর্খা রেজিমেন্টের কাপ্তেন ক্যামেরণ নিহত হন। আর মাস্টার দাকে অবশেষে যে ধরে ফেলেছিল সেও ছিল গুর্খা।

গুর্খারা গাই গরু দিয়ে হাল চাষ বরদাশত করতো না। দেখলেই গাইকে ছেড়ে দিয়ে চাষীদের উপর হামলা কর্তো।

কিন্তু, ততদিনে গুর্খাদের মধ্যেও সজাগতা এসেছে। একটা কারণ বাঙ্গালী সংস্পর্শ।

কমান সিংরা বুঝতে আরম্ভ করেছিল ঃ কি তাদের অভাব?

তাই বলতো ঃ গুর্খা লোগকা হাতিয়ার হোগা আওর বাঙ্গালী লোগ কা মগজ এক হোয়েগা তব কুয়ী নেহি সেকেগা। গুর্খার অস্ত্র, বাঙ্গালীর মগজ একত্র হলে কেউ আটকাতে পার্বে না।

দুটা জিনিস, এই মনোভাবকে বিস্ফোরণের চরমে নিয়ে যায়। অমৃতসরে ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড-যখন নিরস্ত্র জনতার উপর মিলিটারী কর্তৃক গুলি বর্ষণের ফলে ৩৭০ জন নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়। এই মিলিটারী ছিল গুর্খা ও বালুচ। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ভারত ব্যাপী এবং ভারতের বাইরেও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ গান্ধী কর্তৃক এই সময় ভারতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি লোকের অপরিসীম শ্রদ্ধা।

১৯৩০ সালের এপ্রিলে যখন ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে চট্টগ্রামে মাস্টার-দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বাঙ্গালী বিপ্লবীরা মিলিটারীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে রত হয়েছিল তখন ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে পেশোয়ারে দুই প্লেটুন মিলিটারী নিরস্ত্র জনতার উপর

www.pathagar.com

গুলি করতে অস্বীকার করে। উপরিস্থের আদেশ অমান্য করার অপরাধে একজন গাড়োয়ালী গুর্খা হাবিলদারকে কোর্ট মার্শাল করে দীর্ঘ মেয়াদী জেল শাস্তি দেওয়া হয়।

নেপালে ১৮৪৬ থেকে এক রাণীর সাহায্যে রাজাকে দেবতায় পরিণত করে প্রধানমন্ত্রী জং বাহাদুর পুরুষানুক্রমে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেন । বৃটিশ তাঁর সাথে আঁতাৎ সৃষ্টি করে নেয়। রাজা ত্রিভুবন সিংহাসনে আরোহন করেন ১৯১১ সালে। অনেক চেষ্টায় জং বাহাদুর রানাদের ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেকে কনস্টিটিউশনাল মনার্ক (আইনানুগ রাজায়) পরিণত করেন।

তুরস্কে ১৫৭৮ থেকে প্রায় ৭৮ বৎসর সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা চালিয়ে ছিলেন হারেম থেকে সুলতানগণ। গোড়ায় তুরস্কের জবরদস্ত সুলতান সোলায়মান একরূপ ভেড়া বনে গিয়েছিলেন হুররেম সুলতানের নিকট। এই ছোট্ট খাট্ট নারী, লাল চুল, নাক উপর দিকে উল্টানো, চেহারায় কোন বিশেষত্ব নেই—কিন্তু মেজাজ এবং ষড়যন্ত্র করার পটুতা অসাধারণ। নিজের অযোগ্য পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য কৃতী যুবরাজ মুস্তফার প্রাণদণ্ড বিধান করান সুলতানকে দিয়ে। অতঃপর খাঁচা-প্রথার প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ রাজপুত্রদের হারেম বা অন্তঃপুরে বন্দী থাকতে হতো। ফলে রাজপুত্রদের দৈহিক ও মানসিক শিক্ষা অবহেলিত হয়ে পড়ে। তাঁরা নামকা ওয়াস্তে সুলতান হতেন। ক্ষমতা চালিয়ে গিয়েছেন হুররেম এবং বাফোর ন্যায় সুলতানাগণই।

তবে, ওসমানলী তুর্কী বংশকে এভাবে নিবীর্য্য করা সম্ভব হয়নি। নিজের প্রতিভা বলেই তাঁদের কেউ কেউ খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং জ্ঞান ও বল-বীর্যের ধারক 'অহিলার' আন্দোলন দ্বারা নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

www.pathagar.com

হিন্দী-বিভ্রাট

ইরাক ঃ ১৯১৮ ঃ

বিহারী প্রৌঢ় হাবিবুর রহমান কোট পরেন বটে, টাই নয়,মাথায় পাগড়ি-আর এত ডামা-ডোলের মধ্যেও তীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে পাঞ্জগানা নামাজ পড়েন।

ফ্রান্সিস আমার সাথে তাঁকে মিলাতে চেষ্টা করেন। চেহারা সুরৎ, সাজ-পোশাক, হাব-ভাব চলন বলন কিছুতেই মেলেনা।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করেন তার ভাষা তুমি বোঝ, তোমার ভাষা সে বোঝে?

আমি বল্লুম ঃ না।

ফ্রান্সিস বলেন ঃ অথচ, বলছো উভয়েই ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়া তা হলে ভেরী ভেরী বিগ একটা কান্ট্রি ?

আমি বল্লুম: বটেই তো।

এবার ফ্রান্সিসের নজর যার কোয়ার্টার-মাষ্টার রজার্সের চীফ ক্লার্কের দিকে। ইউ কে দামোদরণ। মাদ্রাজী, কালো, মুখে বসন্তের দাগ-বুটি তুলেছে। কথা বলে ঝড়ের মতো, ড. পেলেই এত জোরে উচ্চারণ করেন। জাজকে পুরো উচ্চারণ করেন জাড্জ। টাইপ করেন তুফানের মত, মেশিন যেন এঁটে উঠতে পারেনা।

আর, দামোদরণ যত ইণ্ডিয়ান অযোদ্ধা ফলোয়ার আছে-ভিস্তি, কুক, নাপিত ধোপা, কুলী-কামিন সকলের উপরা'লা তারা ভয়ে দামোদরের ত্রিসীমায় ঘেঁষেনা।

ফ্রান্সিস জিগ্যেস করেন ঃ দামোদরের ভাষা তুমি বোঝ, তোমার ভাষা দামোদর বোঝে ?

আমি বল্লুম ঃ না।

ফ্রান্সিস আরেক পশলা ভেবে উত্তর করেন ঃ তা হলে ইণ্ডিয়া মাষ্ট বী (অবশ্যই হবে) এ ভেরী ভেরী বিগ কান্ট্রি!

www.pathagar.com

তারপরে শিখ—টেলে সিং, মনুহর সিংহের দল-পরম বিস্ময়। সাহেবদের মত ফর্সা, মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, মুখে এক ঝাড় দাঁড়ি, কানে দরজার কড়া সমান সোনার মাকড়ি, হাতে বলয়।

মনুহর সিংকে সাহেব জিগ্যেস করেন ঃ এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

সিং বলে ঃ সেঠেশন (ষ্টেশন)।

সাহেব গর্জে ওঠেন ঃ হোয়াট ?

সিং বিনা-দ্বিধায় উচ্চারণ করে ঃ সেঠেশন। তেমনি স্কুলকে সকুল, স্কালপেলকে সেকালপেল।

সাহেব রুল হাতে নেন। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সাহেব কাতর হয়ে বলেন ঃ ফর গডস সেইক, ফর যীশাস ক্রাইষ্টস সেইক (ঈশ্বরের দোহাই, যীশু খৃষ্টের দোহাই)- সিং যেন কখনও আমার সামনে না আসে।

পরের দিন ফ্রান্সিস আমাকে বলেন ঃ তোমাদের একটা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (সাধারণ ভাষা) আছে না, যা দিয়ে তোমরা পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময় কর?

আমি বল্লুম আছে বৈ কি !

ঃ কি নাম সে ভাষার?

ঃ হিন্দী বা উর্দু।

ফ্রান্সিস বলেন ঃ আমাকে হিন্দী শেখাও, আমি হিন্দী শিখব।

আমি বল্লুম, বেশ।

যে লোকই ভেতরে ঢোকে তাকে বলতে হয় ঃ শাট দি ডোর। দরজা খোলা থাকলে বাইরের বরফ জমানো ঠাণ্ডা ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। ভেতরে তো আমরা ব্রেজিয়ার জ্বালিয়ে তার উষ্ণতায় কাজ কচ্ছি। নতুবা, ঠাণ্ডার চোটে লেখবার জন্যে আঙ্গুল চালান যায় না।

ফ্রান্সিস বলেন ঃ কাজের কথাগুলো আগে শেখা হউক। প্রথমেই শাট দি ডোর।

আমি ব্লক হরফে লিখে দিলুম ঃ শাট-বনড্হ্ করো। ডোর-দরওয়াজেহ্।

ফ্রান্সিস ছোট ছেলের ন্যায় আওড়াতে লাগলেন ঃ ডোর দরওয়াজেহ্ ঃ শাট বনড্হ্ করো। শাট দি ডোর ঃ দরওয়াজেহ্ বনড্হ্ করো।

বহুবার আওড়ালেন। কিন্তু বুড়ো তোতার কি অত সহজে মুখস্থ হয়? মুখস্থ থাকে?

পরের দিন সাহেব তাঁর নব-লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে উদ্যত হলেন। ইচ্ছে করেই দরজা খোলা রাখলেন আর আর্দালীকে হুকুম কর্লেন ঃ কমান সিং, ওয়াজেহ্ বনড্হ্ করো।

www.pathagar.com

কমান সিং তার কোন অর্থ করতে না পেরে আমার দিকে চেয়ে জিগ্যেস কর্লে ঃ বাবুজি, সাহেব নে কেয়া বোলতা ?

সাহেব অধৈর্য হয়ে ততক্ষণে চিৎকার তুলেছেন ঃ ফর গডস সেইক, ওয়াজেহ্ বনড্হ্ করো ম্যান।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বল্লুম ঃ দরওয়াজাহ্ বনড্হ্ করো।

সাহেব মাথা নেড়ে হেসে উঠলেন ঃ অহ ইয়েস দরওয়াজেহ্ বনড্হ্ করো।

ততক্ষণে কমান সিং দরজা বন্ধ করে ফেলেছে।

তবে, বুড়ো ফ্রান্সিস ছিলেন অত্যন্ত বাতিক গ্রস্থ। আমাদের কাজ সারা দিন বেশীর ভাগ ছিল পেনিয়ারগুলো চেক করে দেখা—যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফেরৎ কোন পেনিয়ারে [ঔষধের একরূপ সিন্দুক] কত খানি শর্টেজ হয়েছে, কি কি দিয়ে তাকে আবার পুরো কর্তে হবে।

এই উপলক্ষে প্রায়ই বলতে হয় ঃ ক্লোজ দি লিড, (ডালা বন্ধ করো)

সাহেব জিগ্যেস কর্লেন ঃ ক্লোজ?

আমি বল্লুম ঃ বনড্হ্ করো।

ঃ হোয়াট! শাট বনড্হ্ করো, ক্লোজ বনড্হ্ করো?

সাহেবের সন্দেহ হলো ঃ এই এলামটা আমাকে সবই ভুল শেখাচ্ছে।

আমাকে টানতে টানতে ঃ দামোদরণের দফতরে নিয়ে ওঠালেন। সব শুনে দামোদর রায় দিলেন ঃ হাঁ শাট বনড্হ্ করো, ক্লোজ বনড্হ্ করো।

বুড়ো আশ্চর্য হয়ে গেলেন ঃ বল কি হে, শাট বনড্হ্ করো, ক্লোজ বনড্হ্ করো? এমন আজগুবি ভাষা শিখে আমার কাজ নেই।

অথচ, এটা ছিল বুড়োর ব্যক্তিগত বাতিক। কারণ, এই ঘটনা শুনে বহু সাহেবই আশ্চর্য হয়ে যেতেন। বলতেন ঃ কেন, আমরা ক্লোজ দি ডোর এবং শাট দি লিডও বলতে পারি দুটো তো একই কথা।

কিন্তু, ফ্রান্সিস সাহেবের বিচারে নয়। তিনি শাট দি লিড, ক্লোজ দি ডোর বলতে কখনও রাজী নন।

সাহেব ভাবলেন ঃ এলামের আর দোষ কি! হিন্দী ভাষাটাই আজগুবি। এই হারামজাদা ভাষা শিখে কাজ নেই।

আমার প্রতি তাঁর প্রসন্নতা ফিরে এলো। বরং আমার যাতে কোন উন্নতি হয় তার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

একদিন আমাকে কাছে ডাকলেন। খুঁটিয়ে পারিবারিক অনেক খবর জেনে নিলেনঃ

www.pathagar.com

মা আছেন, বাবা আছেন, বাবা কি করেন, বড় ভাই কি করেন, ছোট ভাই বোনদের কার বয়স 'কত' ? সব শেষে বড় প্রশ্ন করলেন ঃ দেশে তো ফিরে যাবে, ফিরে গিয়ে কি কর্বে ?

আমি বল্লুম ঃ কোন চাকরি বাকরি।

পরের দিন বল্লেন ঃ আমি ঠিক করেছি তুমি ডাক্তার হবে। কতই বা বয়েস ? এখনও কয়েক বছর পড়াশুনোয় কাটিয়ে দিতে পার্বে।

সাহেব জানেন না যে আমি বিবাহিত। পাঠ্য জীবনে আমার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

আমি গেলুম বাঁকা পথে। জিগ্যেস কর্লুম ঃ খরচ যোগাবে কে ?

ফ্রান্সিস বল্লেন: সেটাও আমি চিন্তা করে দেখেছি। আমি এমন চিঠি পত্র যোগাড় করে দেব যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি তাতে কিছু নাও করে তোমাদের ন্যাশন্যাল গভর্ণমেন্ট তোমার জন্য অবিশ্যি কিছু কর্বে। আমি বল্লুম ঃ আমাদের তো কোন ন্যাশন্যাল গভর্ণমেন্ট নেই।

বুড়ো এবার গর্জ্জে উঠলেন ঃ ম্যান। আমি ভালরূপেই জানি যে তোমরা বৃটিশের অধীন। বৃটিশের ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট তোমাদের দেশে সর্বে সর্বা। তবুও তোমাদের একটা ন্যাশন্যাল গবর্ণমেন্ট, একটা ন্যাশন্যাল ফাণ্ড নিশ্চয়ই থাকবে।

আমি বল্লুম ঃ ওসব কিছুই নেই।

ফ্রান্সিস স্বাধীন দেশের মানুষ। কোন অধীন দেশে তাঁর কখনও পা পড়েনি। তাঁর ধারণাতেই আসছেনা তেত্রিশ কোটি লোকের এক বিরাট বিচিত্র দেশ—সেটা কি করে এমন অধীন হতে পার্লো যে তার কোন জাতীয় সরকার নেই, জাতীয় তহবিল নেই!

www.pathagar.com

মিলিটারীতে সমকামিতা

হাবিলদার পরশুরাম। দীর্ঘদেহ, বেশ ফর্সা রং, মেয়েলী মুখ, বড় বড় কাজল চোখ। তাকে যোদ্ধা হাবিলদার কল্পনা করা যায় না। সে আসলে ফলোয়ার হাবিলদার।

এই মাদী পুরুষটার নাম পরশুরাম। পাশের সেকশনে একখানা টুলের উপর বসে থাকে। আসতে যেতে আমাকে দেখলেই দাঁড়িয়ে উঠে সালাম দেয়।

আমার টেবিলের পাশে বেড়ার কিনারায় একটা শেলফ দাঁড় করানো। কাগজের ফুল ও লতাপাতা দিয়ে এমন সুন্দর করে সাজানো যে দেখে থাকতে হয়।

কিন্তু, যে সাজিয়েছিল-সুখানা-কমান সিং এর পূর্ববর্তী আর্দালী-সে নেই। সে এখন আন্দামানে ১৪ বছর জেল খাটছে।

ব্যাপার হলো মিলিটারীতে—বিশেষত ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেখানে নারী বর্জিত জীবন—সমকামিতার ঘটনা খুব বেশী।

আমেরিকানরা বলে ঃ সমকামিতা এংলো-সেকশন জাতির চরিত্র। আসলে এটা আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। কারণ, কোরান শরীফে লুত পয়গম্বরের দিনে আমরা এর উল্লেখ দেখতে পাই। সডম শহর এজন্যে সব চেয়ে কুখ্যাত ছিল। এর থেকে ইংরেজীতে সমকামিতাকে বলে 'সডমী'। 'সডমীর শিকার পুরুষকে বলে 'ক্যাটামাইট'।

কেউ কেউ বলেন ঃ সমকামিতা ইটালী থেকে ফ্রান্স হয়ে বিলাতে এসে ছড়িয়ে পড়ে। আজ বৃটেনে ও যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিতা আইনের চোখে আর অপরাধ নয়। একে ভালবাসারই একটা রকম-ফের মনে করা হয়।

কিন্তু বিলাতে জন-সাধারণ ও আইন ছিল সমকামিতার ঘোর বিরোধী। অথচ, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যার মধ্যে ছিলেন লর্ড ও বিশপ সমকামিতায় অভ্যস্ত। এর এক বলি হয়ে পড়েন কবি অস্কার ওয়াইল্ড। শ্লেষাত্মক ছোট কবিতা, গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি ও মনোভঙ্গীর জন্য তিনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মাষ্টার-পীস হলো উপন্যাস ঃ পিকচার অব

www.pathagar.com

ডোরিয়ান গ্রে। ১৮৯০-এ সেটা প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স ৩৬ বৎসর। পর বৎসর মার্কুইস অব কুইনসবেরীর পুত্র ২২ বৎসর বয়স্ক লর্ড এলফ্রেড ডগলাসের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এলফ্রেডও কবি। মার্কুইস অভিযোগ করেন যে ওয়াইল্ড তাঁর পুত্রের সাথে অসদাচরণ করে থাকেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস ও জর্জ বানার্ডশ' সম্ভাব্য বিপদের উল্লেখ করে ওয়াইল্ডকে বিদেশ যাত্রা করতে পরামর্শ দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা কড়ি তুলে ওয়াইলড দেশ ত্যাগের উপক্রম কচ্ছেন এমন সময় গ্রেফতার হয়ে তাঁকে আসামীর কাঠ-গড়ায় এসে দাঁড়াতে হলো। ১৮৯৫। তাঁর দু'বছর জেল হয়ে গেল। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি প্যারিস চলে যান।

সেখানেই ১৯০০ সালের ৭ই ডিসেম্বর নির্বান্ধব অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। লর্ড এলফ্রেডের মৃত্যু হয় ১৯৪৫ সালের ২০শে মার্চ।

নারী বর্জিত কর্ম ক্ষেত্রে পুরুষদের সমকামিতার প্রসার হওয়া কিছুটা স্বাভাবিক। পল্টন জীবনে এর কিছু কিছু আলামৎ আমি দেখতে পাই। 'অ' নামের একটা বালকের পাছা এত মোটা ছিল যে এবং চলতে গেলে এমন আন্দোলিত হতো যে আমরা নেপথ্যে 'নওলা-দওলা' 'নওলা-দওলা' বলে তাকে ঠাট্টা কর্তুম। অনেক সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে তার প্রমোশন হয়ে যায়। অবশ্য তার প্যারেড ছিল ভাল। তবে, মাজার জোরও যে তার সঙ্গে যোগ হয়নি তা হলফ করে বলা যায় না।

হাবিলদার মেজর শ' ছিলেন পল্টনে রিক্রুটদের মধ্যে খুব সিনিয়র। যেমন জোয়ান, তেমন প্যারেডও করাতে পার্তেন চমৎকার। হঠাৎ তাঁর মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন নাম ধরে আমাদের ডাকতেন আর বলতেন 'অমুক, কামড়ে খাব।' কিছু দিন পর তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান।

এর চেয়েও গুরুতর হলো সন্যাসীর ব্যাপার। এক অত্যন্ত সিনিয়র সেপাই-পরে হাবিলদারের ডাক নাম ছিল সন্যাসী। চলনে-বলনে তাঁকে মনে হতো যেন গৌক পরে আছেন। হঠাৎ সমকামিতার জন্য কোর্ট মার্শাল হয়ে তাঁর আন্দামান জেল হয়ে গেল।

তার পর ফলোয়ার বাচ্চুর কোর্ট মার্শাল হলো। দাক্ষিণাত্যের লোক। অভিযোগ ঃ সে সমকামিতা কর্তো। তার 'ক্যাটামাইট' হলো দাক্ষিণাত্যের আর এক ফলোয়ার বালক রামস্বামী। উভয়ের একই ভাষা ঃ সম্ভবতঃ ক্যানারীজ।

কোর্ট মার্শালগুলো এক-তরফা ব্যাপার। তবে আসামীর 'বন্ধু' বলে একজন অফিসারকে সঙ্গে রাখা হয় এদের কোর্ট মার্শালে রাখা হয়েছিল লেফটেন্যান্ট ডানিংকে। তাঁর প্রধান যোগ্যতা লোয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ডে ক্যানারীজ পাশ করে তিনি দু'দুবার সরকারী পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ডানিং উভয় আসামীকে ক্যানারীজ ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে চার্জ বুঝিয়ে দিলেন। তারা হা করে তাকিয়ে থাকল। কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

কথ্য ভাষা ও কেতাবী ভাষার পার্থক্যের দরুন এমনই হয়। ডানিং শিখেছেন

www.pathagar.com

কেতাবী ভাষা। আর সাহেবদের উচ্চারণ বুঝতে পারাই মুশকিল।

যাহোক উভয়ের ৩২ বেত করে দণ্ড হলো। পরে একদিন দেখি ঃ মই-সিঁড়ির সঙ্গে বেঁধে প্রভোষ্ট মার্শালের লোক দুজনের পিঠে বেত মারছে।

ফলোয়ারদের শিক্ষার জন্যে এই কোর্ট মার্শাল ও বেত মারা প্রকাশ্যে করা হয়েছিল।

কিন্তু, সমকামিতার প্রকোপ আমি বুঝতে পার্লুম যখন একবার সেন্ট্রী ডিউটী কর্তে হয়েছিল ৮ ইণ্ডিয়ান জেনারেল হাসপাতালের কয়েদী বিভাগে। কাঁটা তারের ঘেরার ভেতর ছিল এই কয়েদী তাঁবু। চোখে পড়তো নানান জাতের কয়েদী—বিশেষ করে কয়েকজন চীনা—মস্ত মাথা, শিশুর ন্যায় ঘুমুচ্ছে, শুনতাম ওরা ভীষণ নর-হন্তা। খাবারের বালতির আওয়াজ হলেই ওরা জেগে উঠতো, শিশুর ন্যায় ফুকারতো 'খানা লেলে' তারপর দুই আঙ্গুলের ফাঁকে দুটা কাঠি ম্যাজিকের মতো সঞ্চালিত করে তারা খেতো—আমরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম।

এর উল্টো দৃশ্য জোগাতো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ এলাকার এক হাবিলদার—তার গলার আওয়াজ এত চড়া আর তাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে 'ডোন্ট কেয়ার' করার এমন এক ভঙ্গী—সে কথা বলে উঠা মাত্রই সকলে ভয়ে চুপ হয়ে যেতো।

আর, সে সকলের চোখের উপরই কম্বল উল্টিয়ে ঢুকে যেতো আর এক রোগীর বিছানায়—যে বহুকাল থেকেই তার 'ক্যাটামাইট' এর কাজ করে আসছে।

পরে আমি যখন এই হাসপাতালের কেরানী ও সেকশন ইনচার্জ হয়ে আসলুম হঠাৎ যেন আমি এক পাল হাঙ্গরের মধ্যে পড়ে গেলুম যারা লোফালুফি করে আমাকে ছিঁড়ে খেতে চায়—এক দম আস্ত, লবন মাখানের জন্যেও দেরী না করে। তখন আমার বয়স ২০ মুখে কি ছিল জানিনে। কিন্তু, আমাকে দেখেই ঐ বিশেষ এলাকা থেকে রিক্রুট করা হাবিলদারের দল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। এরা সব রিটায়ার্ড হাবিলদার—এককালে আর্মীতে খুব হাঁক ডাক করেছে—এখন যুদ্ধের প্রয়োজনে হাসপাতালে ডিউটী কর্তে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের উপর—সকলেই আমার অধঃস্তন—কিন্তু আমাকে বাহ্যত ঃ সম্মান করলেও চোখে মুখে কামনার আগুন জ্বালিয়ে তারা যে ভাবে হন্যে হয়ে উঠে তা খুব অপমানজনক মনে হয়। পরস্পর যেভাবে চোখ টেপাটেপি করে তার অর্থ বুঝতে কারও কষ্ট হয় না।

অবশেষে আমি এক খুঁটি পেয়ে গেলুম। আমার নিজস্ব আর্দালী রাম পরশাদ দোবে। ইণ্ডিয়ান আর্মীতে প্রথম রেজিমেন্ট ছিল ফার্ষ্ট ব্রাহ্মিণ। রাম পরশাদ সেই রেজিমেন্টের রিটায়ার্ড হাবিলদার। দীর্ঘ-দেহ, ফর্সা রং, লম্বা দাড়ি দেখলেই মনে হয় সব নীচতার উর্ধ্বে আর্য পুরুষ যেন সামগান কর্তে কর্তে এই মাত্র গঙ্গার কূল থেকে উঠে এলেন। দেশে বোধ হয় আমার বয়সী কেউ আছে—ছেলে কি নাতি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু বইতো। আর আমি তাঁকে আরও বাধিত কর্লুম—যখন বল্লাম ঃ

www.pathagar.com

ঃ দোবেজী।

ঃ হাজুর,

ঃ আমি আপনার কাছে হিন্দী শিখব।

দোবেজী ভারী খুশী হলেন। খাতা বানিয়ে হিন্দী হরফগুলো লিখে দিলেন আমার কপি করার জন্যে।

আমি আর রাম পরশাদ মিলে ঐ হাঙ্গরের দলকে শায়েস্তা করে ফেল্লুম। তারা বুঝতে পার্লে এই সাহেব বাচ্চা হলে কি হবে কাজের বেলায় খুব কড়া।

রাম পরশাদ দোবের উন্নত দেহ-মন ও আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দাশ্রু বইছে, এরকম একটা ছবি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল ও অক্ষয় হয়ে আছে।

বেইস ডিপো মেডিক্যাল স্টোরে এসে সুখানার ব্যাপার ছাড়াও একটা বালক প্রষ্টিটিউটের সন্ধান পেলুম। সে হচ্ছে সুইপার সঙ্গৎ। মেথরদের মধ্যে ফর্সা মেয়ে আমি পূর্বেও দেখেছি। কিন্তু, সঙ্গতের মত এত ফর্সা ছেলে আর যেন দেখিনি। এই ষ্টোরে এক গাদা বৃটিশ সার্জেন্ট কাজ করে। কেউ টার্ম শেষ করে দেশে চলে গেছে। জেফ্রীসের ন্যায় কেউ কেউ এখনও আছে। আরও কত যাবে আসবে।

সঙ্গৎ ছিল এদের অনেকের জুড়োবার ঠাঁই।

আমি যেখানেই গেছি আমার একটা ভূমিকা হয়ে উঠতো লোকের চিঠি পত্র লিখে দেওয়া। সঙ্গতেরও আমি ছিলুম নির্ভর। তার প্রেমাস্পদ সার্জেন্ট যারা দেশে চলে গিয়েছে তাদের কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লেখাতো। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। পরে আসল ব্যাপারটা বোধগম্য হলো। তখন ইঙ্গিতপূর্ণ চিঠি লিখে দিতাম আর পরম কৌতূহলে অপেক্ষা কর্তুম কারও উত্তর আসে কিনা।

কিন্তু, কখনও কোন উত্তর আসেনি। বিলাতে পৌছে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সুইপার বালককে কে আর মনে রেখেছে।

সুখানা প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠেছিল যখন মাদী হাবিলদার পরশুরাম তাকে ত্যাগ করে দুশমন চেহারার হাবিলদার জগজীবনকে প্রশ্রয় দিতে থাকে। সুখানা একদিন পরশুরামকে ছুরি মারে—যার ক্ষতচিহ্ন পরশুরাম বয়ে চলেছে এবং তাকে চিরদিন বয়ে যেতে হবে। কোর্ট মার্শাল বাইরের ব্যাপারটাই দেখেছে। একজন ফলোয়ার তার উপরি হাবিলদারকে ছুরি মেরেছে। ভিতরের ব্যাপারের সন্ধান পায়নি। তাই ১৪বছরের জন্যে জেলে ঠেলে দিয়ে সুখানার প্রতি তাদের দায় সেরে রেখেছে। তবে, এতে অক্ষত বেঁচে গেছে হাবিলদার জগজীবন। কারণ সুখানার পণ ছিল তাকেও হত্যা কর্বে।

www.pathagar.com

শোনার নজরুল

দক্ষিণ কুর্দিস্তানের রাজধানী কির্কোক। এটা এ অঞ্চলের প্রধান পার্বত্য দুর্গ।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর। কির্কোক দুর্গ দখল করে আছি আমরা ৪৯তম বেঙ্গলীজ।

কুর্দীরা কিছু বৃটিশ অফিসারকে হত্যা করেছিল। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে যে সৈন্য দল পাঠান হয় তাতে ৪৯তম বেঙ্গলীজ এর একটা ডিটাচম্যান্টও ছিল।

যুদ্ধের ব্যবস্থাপনায় গোড়াতেই বিবেচ্য জায়গাটা 'ওপেন কান্ট্রি' না 'ক্লোজ কান্ট্রি' অর্থাৎ সমতল না পর্বত-সংকুল।

ওপেন কান্ট্রিতে যুদ্ধ হতো একভাবে—তখনকার দিনে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আর ক্লোজ কান্ট্রিতে যুদ্ধ হতো অন্য ভাবে—কলাম করে।

এক একটা কলাম তার টার্গেট সামনে করে এগিয়ে যেতো পথের যাবতীয় বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করে ঃ যত বিরোধিতাকে শায়েস্তা করে দিয়ে। এরূপে এক কলাম লক্ষ্যে পৌছতে পারলে তখন কারবার শেষ হয়ে যেতো।

এক একজন সেনাপতির নামে এক একটি কলামকে ডাকা হতো। যেমন, আমাদের কলামকে বলা হতো স্যাণ্ডিফোর্ড কলাম—আমাদের কমাণ্ডার লে: কর্ণেল ডি ডি স্যাণ্ডিফোর্ডের নামে। অন্যান্য য়্যুনিটের আরও অনেক ডিটাচম্যাণ্ট যোগ দিয়েছিল। স্যাণ্ডিফোর্ড ছিলেন এই কলামের সর্বাধিনায়ক।

সেদিন কতকগুলো বোমা আমরা দুর্গের এক অংশ থেকে অন্য অংশে সরাচ্ছিলুম। হঠাৎ খবর আসলো 'যুদ্ধ বিরতি' হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা জিতে গেছি। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি বৃটিশ-জেনারেল টাউনসেণ্ড স-বাহিনী তুর্কীর হাতে ধরা পড়েন কুট-আল-আমারায়। এই দারুণ বিপর্যয় ঠেকাতে ভারত থেকে অনেক কাঁচা-পাকা বাহিনী মেসোপোটেমিয়ায় এনে জমায়েৎ করা হয়—আমরাও আসি-তারপর একটানা তিন বৎসর যুদ্ধ ক্ষেত্রে ডিউটী করে যাচ্ছি।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে বৃটিশের কোন তুলনা ছিলনা। তারা এই নীতি উদ্ভাবন

www.pathagar.com

করেছিল যে প্রথমেই শিকারকে তার আইডেন্টিটি' (পরিচয়) ভুলিয়ে দিতে হবে। ইরাককে বলতে হবে মেসোপোটেমিয়া' (তার পুরাতন নাম)। তুলনায় প্রথম দিকের সাম্যাজ্যবাদী শক্তি-যেমন ভারতবর্ষে মোগল-ছিলেন অনেক কাঁচা। মুসলমানরা প্রায় সাত শত বৎসর ভারতে রাজত্ব কর্লেন—'এক দেহে লীন' হয়ে গেলেন, কিন্তু-ভারতের নাম তাঁদের কাছে হয়ে থাকলো 'হিন্দুস্তান'—এমন কি আয়ুব খাঁ পর্যন্ত এই 'নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা' রোগে ভুগেছিলেন।

তিন বৎসরের একটানা কসরতের মধ্যে হঠাৎ এই বিরতি। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হতে চাচ্ছিলনা—না শরীরের দিক দিয়ে, না মনের দিক দিয়ে। তবে হঠাৎ একটা দোলায় বাড়ির ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। 'ঠেলার চোটে বাবার নাম ভুলে' গিয়েছিলুম। এখন সে নাম স্পষ্ট মনে পড়তে লাগল আর তাঁর চেহারা ও ছবি। মায়ের হাতের রান্না মনে পড়তে লাগল—আর ভাইদের মুখ। আর আমার বেলা আরও এক কিশোরীর—যে বিড়াল-ছানার ন্যায় নিত্য 'অন গার্ড' যার দুই চোখ একত্রে দেখা যায় না, এক চোখ অনাবৃত তো অন্য চোখ অবগুণ্ঠনের তলায়।

এই অবস্থায় যদি ছুটি দিতে চাওয়া হয়—বাড়ি ঘুরে আসার জন্যে—তো কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। আর অজুহাতের কারু অভাব হবেনা। অগত্যা নির্ভর কর্তে হলো লটারীর উপর।

এই লটারীতে নাম্বার উঠায় আমাদের তাঁবুর মনোরঞ্জন স্বল্প ছুটীতে এক চক্কর বাড়ি ঘুরে আসে। সিলেট হবিগঞ্জের স্কুল শিক্ষক রাজ কুমার দাসের ছেলে—যার কথা আমি পূর্বেও বলেছি।

যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে ডিপো হয়ে বাড়ি যেতে হয়। বাড়ি থেকে ডিপো হয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফিরে আসতে হয় ঃ 'যুদ্ধ বিরতি' ঘোষিত হলেও বিরতি কার্যে পরিণত হতে কয়েক মাসের ধাক্কা লাগে।

মনোরঞ্জন ফিরে এলে কিন্তু, ডিপোতে দেখে এসেছে হাবিলদার কাজী সাহেবকে। কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার। সুতরাং প্যারেডের বা অন্য ডিউটীর বালাই নেই। কাঁচা রসদ সাপ্লাই থেকে নিয়ে এসে বাহিনীর বিভিন্ন য়্যুনিটে জোগান দেওয়া এটাই কোয়ার্টার-মাষ্টারের হাল টাট কাজ। কাঁচা রসদ তুলে নিয়ে প্রত্যেক য়্যুনিট তা নিজের পাকশালে পাক করে বিতরণ করে খায়। এই হাত বদলের প্রক্রিয়ায় সব ভাল জিনিস—মাংসের সুস্বাদু অংশ দুর্লভ কোন ফল-মূল যা মাথা গুনতি না দিয়ে এড হক ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে, লাইম জুস ইত্যাদি গিয়ে জমে কোয়ার্টার মাষ্টার বিভাগে আর সে সব খেয়ে কোয়ার্টার-মাষ্টারের লোকেরা এক একজন খোদার খাসী হয়ে ওঠে।

তবে, হাবিলদার কাজী সাহেবের ব্যাপার অন্য। তিনি বসেছেন হার্মোনিয়াম সাম্নে নিয়ে—কাপের পর কাপ চা খাচ্ছেন, খিলির পর খিলি পান মুখে দিচ্ছেন—আর তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে গানের পর গান। বল্লে ঃ মনোরঞ্জন আমি ১৯১৭ সালের ১লা

www.pathagar.com

জুলাই করাচী পৌঁছেছিলাম আর মাস না ফিরতেই গিয়ে উঠি মেসোপোটেমিয়ান এক্সপিডিসনারী ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বস্রায়—ঐ দেশের প্রবেশ-দ্বারে।

নজরুল আমার বছর খানিকের ছোট। তবে, এক বছরের মধ্যেই ম্যাট্রিক উত্তরণ, কলেজে প্রবেশ, বিবাহ—আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটেছিল। ত্রিশালের রামদরিয়াপুর স্কুলে নজরুল তাঁর কৈশোর শেষ করেছিলেন। তারপর সিয়ারসোল রাজ স্কুলে যখন তিনি পড়ছেন তখন তিনি যৌবন-দীপ্ত, তাঁর কবি-সত্ত্বা জাগরিত হচ্ছে। এ সময় তিনি রংরুট হয়ে করাচী যান।

যে অর্থে সৈন্য মানে খুনোখুনির নায়ক নজরুল কিছুতেই তা হতে পার্তেন না। তাঁর দিগ্বিজয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ তাঁকে না ভালবেসে পার্তেনা। তাঁর প্রতিভার ছোঁয়া লেগে প্রত্যেককেই আভিভূত হতে হতো। তাই পল্টনের কোয়ার্টার মাষ্টার অংশেই তিনি স্বাভাবিক ভাবে স্থান পেয়ে গিছলেন। কোয়ার্টার-মাষ্টার হাবিলদারের আসন হয়ে উঠেছিল তাঁর সাধন পাঠ। সেপাই থেকে ল্যান্স-নায়ক, ল্যান্স-নায়ক থেকে নায়ক। নায়ক থেকে হাবিলদার-তাঁর অসাধারণ চরিত্রই এটা সম্ভব করে তুলেছিল।

পরে তাঁকে দেখেছি—ডাঃ মিসেস এস বি. মুখার্জী যখন তাঁকে ফরমাশ কচ্ছেন একটা বিশেষ গান গাইতে—তিনি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে গুঞ্জরে উঠলেন ঃ অরুণ কেন তরুণ আঁখি দাওগো সাকী দাও শারাব। কোথায় লাগে মুখার্জীর ফরমাশ। গানের গমকে সব কিছু তখন দুলতে লেগেছে। মুখার্জীর রোমাঞ্চ হচ্ছে।

করাচীতে কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর আদেশ চালাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি নিজেই নিজের নিয়ন্তা হয়ে আপন জগৎ রচনা করে চলেছেন। আমি ডিপো হয়ে বাড়ি ফিরি—সামরিক জীবন থেকে ছাড়া পেয়ে—১৯২০ সালের শেষ ভাগে ডিপো থেকে নজরুল আগেই ছাড় পেয়ে দেশে অর্থাৎ কলিকাতায় চলে এসেছিলেন।

বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায় হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম এর সামরিক পোশাকে ছবি দেখতুম আর তাঁর কবিতা। বাংলার তরুণ মহলে তিনি এক ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। তখন 'প্রবাসী'কে মনে করা হতো এক দিক থেকে অত্যন্ত সংরক্ষণশীল পত্রিকা। প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে ব্রাহ্ম হলেও তখনকার সংগ্রামী যুগে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন।

কিন্তু নজরুলকে স্বীকার করে না নেওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। হঠাৎ প্রবাসীতেই বেরিয়ে পড়লো সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর 'বন্দী তোমায় জঙ্গী কবি নজরুলের অপূর্ব এক বন্দনা'।

নজরুল কলিকাতার মধ্যাহ্ন সূর্যের ভূমিকা শেষ করে বাংলার মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়লেন। কুমিল্লায় এবং আমাদের চট্টগ্রামে।

www.pathagar.com

রাজা ও দেশ

সত্তর বৎসর পূর্বে আমাদের ছোট বেলায় আমরা 'রাজা ও দেশ'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

রাম সুন্দর বসাকের 'বাল্য শিক্ষা'র উপর আমাদের বাংলা জ্ঞানের গোড়া-পত্তন হয়েছিল। সেই 'বাল্য শিক্ষা'র শেষ বিষয়টি ছিল 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া'।

তখনও সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পর পঞ্চাশ বৎসরও পুরেনি। কিন্তু 'ভারতেশ্বরী মহারাণী'র কথা গাঁয়ের সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের মুখে মুখেও শোনা যেতো। তবে ভারতেশ্বরী বিকৃত হয়ে 'ভাতেশ্বরী' হয়ে গিয়েছিল।

আমরা যখন ১৯১৭ সালে বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিলাম তার আগেই কলিকাতায় ক্ষুদিরাম বসু বোমা ফাটিয়ে প্রথম ইংরেজ মেরেছিলেন—সেজন্য তাঁর ফাঁসী হয়।

এদের বলা হতো 'স্বদেশী'। এদের কথা হলো ঃ কোথায় রাজা ? রাজাতো বিদেশী !

সিলেটের হবিগঞ্জে এক স্কুল-মাষ্টার ছিলেন রাজকুমার দাস। তাঁর বড় ছেলে প্রফুল্ল রঞ্জন ছিল দারুণ 'স্বদেশী'। ধরা পড়ে বিচার হয়ে তার চৌদ্দ বৎসর জেল হয়ে গিয়েছিল। সে সেই দণ্ড খাটছিল রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে।

আর ছোট ছেলে মনোরঞ্জন দাস পল্টনে যোগ দিয়েছিল। ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে একই তাঁবুতে আমরা পড়ি অর্থাৎ অধিবাসী হই।

মনোরঞ্জন আমাকে দাদা ডাকতো এবং আমার ভক্ত হয়ে পড়ে।

১৯১৯ সালে হঠাৎ যুদ্ধ-বিরতি হয়ে গেল। আমরা জেতার দলে। সুতরাং গৌরবে আমাদের বুক ফুলে উঠলো।

মনোরঞ্জন আমাকে বল্লে ঃ দাদা যুদ্ধে তো এসেছিলাম 'রাজা ও দেশের জন্য'। এখন যুদ্ধ জয় হয়েছে। ওদিকে আমার ভাইটি জেলে পচ্ছে। আমার কাজটা তুলে ধরে রাজার নিকট আমার ভায়ের জন্য য়্যামনেষ্টি চাওয়া যায় না ?

www.pathagar.com

আমি বল্লুম ঃ যাওয়াতো উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এক টেলিগ্রাম করে ফেল্লুম ঃ ইম্পেরিয়েল ম্যাজেষ্টী, লণ্ডন। আমি ভারতীয় সৈন্যদলের '৪৯ বেঙ্গলীজ' রেজিমেন্টে মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধরত আছি। যেহেতু যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে আমার কথা বিবেচনা করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ড-ভোগরত আমার ভাই প্রফুল্ল রঞ্জন দাসকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হউক।

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে রসিদ নিয়ে নিলুম।

এক বৎসর পরে আমাদের করাচী আনা হল। ভারতে ওটাই ছিল আমাদের হেড্-কোয়ার্টার। এর পূর্বেই আদেশ হয়ে গিয়েছিল ঃ পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হবে।

ব্যাচ করে করে সৈন্যদের দায় মিটিয়ে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারি মুখে একদিন কোম্পানী অফিসে মনোরঞ্জনের ডাক পড়লো। আমি আর সে দুজনেই ডি কোম্পানীর সিক্সটীনথ প্লাটুনের লোক।

ব্যাপার হলো ঃ বহু ঘাটের পানি খেয়ে সে টেলিগ্রাম ফিরে এসেছে। প্রথমে গিয়েছিল ইম্পেরিয়েল হাউস-হোল্ডের চেম্বারলেনের কাছে। তিনি বল্লেন ঃ ইম্পেরিয়েল ম্যাজেষ্টীক এভাবে সরাসরি সম্বোধন করা যায় না।

তারপরই ফেরার পালা। সে অনেক ঘাট। প্রথমে ইণ্ডিয়া অফিস, তারপর আর্মী হেড কোয়ার্টার্স। অতপরঃ ক্রমে ডিভিশন ব্রিগেড, রেজিমেন্ট ইত্যাদি হয়ে কোম্পানী অফিস।

কাপ্তেন আর, এফ, ফিটজহার্বার্ট তখন কোম্পানী কমাণ্ডার, তাঁরই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে মনোরঞ্জনকে। তিনি টেলিগ্রামের কাণ্ড-কারখানা দেখে এমন ক্ষেপেছেন যে মনোরঞ্জন ভয়ে পথ না পেয়ে বলে দিয়েছে ঃ আমার এক উপদেষ্টা আছে, এটা তারই কাজ।

সাদা মুখ রাগ্‌লে নীল হয়ে যায়। নীল মুখে ফিট্‌জহার্বার্ট হুকুম দিলেন ঃ ডাকো তাকে। এবার আমি গিয়েও হাজির হলাম।

ফিটজ্‌হার্বার্ট চতুর শ্রেণীর সৈনিক—যে দীর্ঘ রুট মার্চ এড়াবার জন্য সঙ্গীন দিয়ে পায়ে ঘা করে সিক রিপোর্ট কর্তো এবং সৈন্যদের হয়ে আমি যে সব লেখাপড়া কর্তুম সেজন্য আমাকে না-পছন্দ কর্তেন।

আমাকে দেখেই ফিটজ্‌হার্বার্ট প্রশ্ন কল্লেন ঃ এ টেলিগ্রাম তুমিই লিখে দিয়েছিলে?

ঃ হাঁ স্যার।

ঃ ইম্পেরিয়েল ম্যাজেষ্টী কে বল দেখি ?

ঃ তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা।

ফিট্‌জহার্বাট এমন এক নজরে আমাকে নিরীক্ষণ কর্লেন—যার মধ্যে রয়েছে

www.pathagar.com

বিস্ময়, ক্ষোভ ও শ্লেষ একসঙ্গে। তারপর আমাকে সমঝিনয়ে দেবার আদেশের সুরে উচ্চারণ কর্লেন ঃ অতএব সমস্ত পৃথিবীরই সর্বেসর্বা।

কিন্তু আমার ছাড়পত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ফিটজহার্বার্টের পাল্লার বাইরে। তবুও ফিট্‌জহার্বার্ট ভাবতে লাগলেন ঃ আমাকে কিভাবে সময় দেওয়া যায়।

একটু ভেবে বল্লেন ঃ ঠিক আছে। তুমি নির্দিষ্ট ব্যাচে যেতে পারবেনা। তারপরের ব্যাচে যাবে।

আমি স্যালিউট দিলুম। মিলিটারীতে হুকুম উচ্চারিত হলেই স্যালিউট দিতে হয়— সে হুকুমের অর্থ যদি এইও হয় যে ঃ কাল সকালে তোমার মাথা কাটা যাবে।

এক সপ্তাহ দেরী আমার জন্য কিছুই না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিন বৎসর কাটিয়েছি। এরপরে আমাদের ধরা হয় জাত-মিলিটারী। মিলিটারী জীবন তখন খুব মিঠা হয়ে আসে।

কিন্তু মনোরঞ্জনকে দু-সপ্তাহ দেরী কর্তে হয়। বাড়ি পৌছে কয়েক দিন পর তার চিঠি পেলুম। লিখেছে প্রিয় লে-nin, আমিও ছাড় পেয়ে বাড়ি পৌছে গিয়েছি।

সে আমাকে ডাকতো লেনিন। কিন্তু নামকে ভেঙ্গে বরাবরই অর্ধেক বাংলা লিখতো।

অদ্ভুত ছেলে ছিল এই মনোরঞ্জন।

www.pathagar.com

আহেলা বিলাতী

৯ বেইস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোরের 'রিপেয়ারেবল' সেকশনের চীফ ক্লার্ক হয়ে বার দিলুম। আমার দফতরটা গোটা একখানি ব্যারাক—মস্ত বড়-এধার ওধার এক চোখের পথ—ইনচার্জ কাপ্তেন ষ্ট্যান্‌লী ফ্রান্সিসও বসেন এক জায়গায়—আহেলা বিলাতী বুড়ো সাহেব, না দেখেছেন প্রাচ্য, না জেনেছেন কালা আদ্‌মীদের, না বোঝেন ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা—রুলার দিয়ে চীফ ক্লার্ককে পিটিয়ে অফিস চালিয়ে নিচ্ছেন।

সাহেবের কোনটি হয়ে দফতরে ঢুকতে হয়। তিনি তখনও আসেননি। তবে, টেবিলের উপর রুলারটা বিদ্যমান—আবলুশ কাঠের পুরুষ্ট গতর—ইশারায় যেন আমার পিঠের ব্যাপ্তি আন্দাজ করে নিচ্ছে।

আমাদের ছোট বেলায় মোক্তবের মিঞাজীরা মাটির উপর আসন বিছিয়ে বস্‌তেন পাশে কঞ্চি বা বেতকে শায়িত রেখে। অভিভাবক শিশুকে তাঁর হাওলা করে বলতেন 'এর হাড় ও চাম্‌ড়া আমার আর মাংস আপনার'। অর্থাৎ, লেখা-পড়ার প্রয়োজনে যত পিটাবেন পিটান, হাড় আর চামড়া অবশিষ্ট থাকলেই যথেষ্ট। মিঞাজীও গম্ভীর বদনে কঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে শিশুকে হুকুম কর্তেন 'কঞ্চি সালাম করো, ওটাই তোমার আসল ওস্তাদ।'

বৃটিশের হয়ে লড়াই কর্তে এসে আজ আমারও সেই অবস্থা।

আর, আচানক এমন এক কাণ্ড ঘটে গেল যাতে মনে হতে লাগলো রুল-প্রহার অনিবার্য।

যুদ্ধের প্রয়োজনে আলাউদ্দীনের দৈত্যের ব্যাপারের ন্যায় এসব ব্যারাক রাতারাতি নির্মিত হয়েছে—পাটাতন, দেওয়াল, ছানি সবই কাঠের। পাটাতন তক্তার পাশে তক্তা জুড়ে—মাঝখানে সামান্য ফাঁক, নীচে কি পরিমাণ গর্ত আছে তা বুঝবার উপায় নেই।

ব্যারাকটা একবার ঘুরে আসতে যেয়ে দেখি এক কোণে একটা ব্যারোমিটার বসানো— নারীর নথের মত তার নাকে ঝুল্‌ছে বেশ দর্শনীয় একটা হর্সশু ম্যাগনেট—ঘোড়ার নালের আকারের চুম্বক।

www.pathagar.com

চুম্বকটা আমি হাতে নিতে চাইলুম—কিন্তু, কি এক আকর্ষণে সেটা আমার হাত থেকে ছুটে দুই তক্তার ফাঁক দিয়ে গলে নীচের গর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল—যেন কোন দৈত্য এটা ঘটানোর জন্য নিঃশব্দে গর্তের ভিতর অপেক্ষা কচ্ছিল।

প্রয়োজন মত বহু লোক দফ্‌তরে দিন-মজুরী করে। কিন্তু স্থায়ী মীনিয়েল আছে চারজন ঃ রামা মহাসূরের বেঁটে, বলিষ্ঠ, বল-দর্পী হিন্দু ঃ ইব্রাহীম—শীর্ণ, কাল, কিন্তু কৌশলী মোপ্‌লা ঃ দুজনে প্রায়ই লাগে, কিন্তু ইব্রাহীমের প্যাঁচের নিকট রামা টিকে থাক্‌তে পারেনা। দক্ষিণ ভারতের রাজানা—কাল, ছোট্ট মানুষ। পাঠান মনু খাঁ—অবসরপ্রাপ্ত সেপাই, তাকে আবার নিয়ে আসা হয়েছে—বয়সের ভারে একেবারে মজে গেছে, চোখেও দেখতে পায় না।

রামা ক্রো-বার ও হাতুড়ি নিয়ে এলো। বল্লো ঃ তক্তা উতাড়কে দেখি খোঁজ পাই কিনা। আমি নিষেধ কর্লুম। কতখানি তক্তা উতাড়তে হবে তাও জানা নেই, আর গর্ত যে কত নীচ পর্যন্ত গিয়েছে কিসেই বা ভর্তি তাই বা কে বল্‌বে। ম্যাগনেটটি হারিয়েছি—অপরাধ হয়েছে। তার ওপর ঘর ভেঙ্গে অপরাধ বাড়াই কেন ?

ইব্রাহিম বুক চিতিয়ে বল্লে ঃ ম্যাগনেটটা আমরা দেখিনি, কোথায় গেল কি করে বলব ?

এটা আমার মোটেই মনঃপুত হলো না। আমি দেখলুম ঃ সময় খুব অল্প, এর মধ্যেই আমাকে সোজা পথে এই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমি মিনিয়েলদের যার যার কাজে পাঠিয়ে দিলুম। নিজে সাহেবের টেবিলের নিকট নীরবে অপেক্ষা কর্তে লাগলুম।

সাহেবকে দেখা গেল ব্যারাকের ও মাথা থেকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি কাছে আসতেই আমি গুড মর্ণিং দিলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্লুম ঃ আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

সাহেব ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলেন ঃ দুঃখিত, কেন ?

ঃ আমি কৌতূহল বশে ম্যাগনেটটা হাতে নিয়ে দেখ্‌ছিলেম। আর ওটা হাত থেকে পড়ে তক্তার ফাঁক দিয়ে গলে নীচে চলে গেছে।

সাহেব ককিয়ে উঠলেন। "ওটা পড়ে গেল, পড়ে গেল! আ-হা হা" জিনিষটা যে আমার নিজের।" তারপর ব্রাচেস শুদ্ধ পাটাতনের ধুলা-বালির উপর হাঁটু গেড়ে বসে তক্তার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, নীচে কিছু দেখা যায় কিনা।

নাঃ, অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না।

উঠে পড়ে বল্লেন ঃ দৈব ঘটনা এর ওপর তো কারু হাত নেই কি আর করা! সুযোগ বুঝে আর একটা ম্যাগনেট যোগাড় করে নিতে হবে।

আমরা দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সত্য কথাটুকু বলে ফেলার পর আমি আর তিনি যেন সমান হয়ে গিয়েছি। বুড়োর সন্দেহপরায়ন চোখ যেন এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহ

www.pathagar.com

ছেড়ে আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। আমার চেহারা সুরৎ একবার ভালরূপে দেখে নিলেন। এবার জিগ্যেস কর্লেন ঃ তোমার নাম কিহে ?

আমি জানতাম যে সাহেব ডাক্তার। ডাক্তারকে কিভাবে রসিয়ে নিতে হবে সেজন্যে আগেই একটা বুদ্ধি ঠিক করেছিলাম। এখন উত্তর কর্লুম ঃ এলাম!

"এলাম"। সাহেব ভারী উৎসুক হয়ে উঠলেন। "বানান কি" ?

আমি বল্লুম ঃ এ এল ইউ এম।

সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। "মানুষের আবার এলাম নাম হয় ? এলাম মানে জান ?"

এলাম হচ্ছে ফিটকিরি। সেটা আমার জানা ছিল। আমি বল্লুম "একটা রাসায়নিক নাম"। সাহেব বলে উঠলেন ঃ নাম বলে নাম ! কত দরকারী তা জান ?

আমাদের হাতে যে-সব কাগজ পত্র আসতো তার কোন কোনটায় এলামের উল্লেখ থাক্‌তো।

সাহেব এলাম বলতেন না। বলতেন ঃ তুমি আড়াই শো পাউণ্ড। তারপর খুব হাসতেন।

বেইস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোরে আমি ঐ বানানেই নাম লিখতুম। মিলিটারীতে নামটা গৌণ, নাম্বারই আসল। আমার নাম্বার ছিল ৮৯১। যতক্ষণ নাম্বার ঠিক আছে নাম তুমি যখন যে বানানেই লিখ তাতে কথা নেই।

মেকিনা ফীল্ড পোষ্টাফিসে এক হিন্দুস্তানী পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তিনি পিয়নদের দাঁড় করিয়ে রেখে বড় বেগ দিতেন।

অতঃপর আমি এক বুদ্ধি কর্লুম। পোষ্টাফিসে কোন কাজ পাঠালেই নাম এভাবে স্বাক্ষর কর্তুম যেন এলেনও পড়া যায়। বোকা পোষ্ট মাষ্টার এতে মনে কর্লেন আমি শেতাঙ্গ নিশ্চয়ই। অতঃপর আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে দিতেন।

হাতের লেখার জন্য আমি সব সময় তারীফ পেয়েছি। ক্লাস এইটে যখন পড়ি তখন গভর্ণরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার স্যর পি সি লায়ন চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আসেন। কলেজিয়েট স্কুলও দেখতে এলেন।

আমাদের ক্লাস-টীচার ছিলেন কৃপানাথ ঘোষাল, হেড পণ্ডিত। কোল্‌কাতার লোক। সাহেবের চেয়ে ফর্সা ছিলেন। আমরা বলতুম 'সাহেব পণ্ডিত'। চট্টগ্রামের লোক শুটকী খায়। কেউ পড়া না পার্লেই বলতেন 'শুটকী খেয়েছো!' শুটকীর উপর খুব চটা ছিলেন। বল্‌তেন ঃ শুটকি খাসনে। শুটকী খেয়ে মাথায় সব গোবর হয়ে যাবে।

কৃপানাথ ঘোষাল ব্ল্যাক বোর্ডে আমাকে দিয়ে এবং জাকির হোসেনকে দিয়ে কিছু লিখালেন। দুজনেই দুই ষ্টাইলের লিখা। পি সি লায়ন ক্লাসে ঢুকে ব্ল্যাক বোর্ডের লেখা দেখে ভারী খুশী হলেন। উভয়ের লেখার খুব তারীফ কর্লেন। জাকির হোসেন আয়ুব

www.pathagar.com

খাঁর আমলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হয়েছিল।

একবার গ্রামের এক লোককে কাল কালি দিয়ে এক আবেদন লিখে দিয়েছিলুম। তিনি বরাবরই ভাবতেন ওটা আমি ছাপা করে এনেছি।

আবুল কালাম শমসুদ্দীন লিখেছেন ঃ মাসিক মোহাম্মদীতে ছাপাবার জন্যে যখন তিনি 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'র প্রথম কিস্ত পান তখন তাজ্জব হয়েছিলেন লেখা দেখে এবং লেখা পড়ে।

সবচেয়ে মজা হয়েছিল আমি যখন সাব-রেজিষ্ট্রার। কেরানী বাবু বল্লেন ঃ ছেলেটি বি-এ পাশ করেছে। জেলা-জজের অফিসে চাকুরির জন্যে একখানা দরখাস্ত লিখে দেন। দরখাস্ত লিখে দিলুম। ছেলের নামটাও স্বাক্ষর করে দিলুম। তাঁকে সদরে পাঠালুম টাইপ করিয়ে দস্তখৎ করিয়ে দরখাস্তখানা দাখিল করে দিতে।

সদর থেকে তিনি দিনে দিনেই ফিরলেন। ভারী খুশী। জেলা-জজ ছিলেন বোধহয় আমার কেপটেইন ষ্ট্রানলী ফ্যান্সিসের জাত ভাই জে ইউনী। তিনি যখন তখনই চাকুরির হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। বল্লেন ঃ দরখাস্ত খানা টাইপ করাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বার লাইব্রেরীর উকীল বন্ধুরা নিষেধ কর্লেন। তাঁরা বল্লেন ঃ এই হাতের লেখাই দাও। ইউনী যা মানুষ, এতেই কাজ হয়ে যাবে। হয়েছেও তাই।

তবে রক্ষে। কেরানী বাবুর ছেলের হাতের লেখাও বেশ ভাল ছিল। এখন তিনি পুরো বয়স চাকুরী করে অবসর নিয়েছেন।

কেপ্টেইন ফ্রান্সিস ধরে নিলেন ঃ আমি মিথ্যায় অভ্যস্ত নই, আমার হাতের লেখা ভাল, আমার কাজ ভাল।

কিন্তু এতে আরেক বিপদ দেখা দিল।

ফ্রান্সিসের জীবন ছিল এক কুকুর হেন্‌রী এবং বেইস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোরের এই কাজ নিয়ে। বাকীটা ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে বেড়াতেন।

এখন তাঁর এক ব্যাধি দেখা দিল ঃ যেখানেই যান গর্ব করে বলেন ঃ কেরানী পেয়েছি আমি। যেমন কর্মী চরিত্র, তেমন হাতের লেখা, তেমন ত্বরিত ও নির্ভুল কাজ।

যুদ্ধের পরে সব ক্লাবেরই হিসেব নিকেশে বিরাট ফাঁক বেরিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের সময় এটাই স্বাভাবিক। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এসব ফাঁক বোজাবার।

ফ্রান্সিসের বড়াইর পরিণতি হলো এই যে প্রত্যেক ক্লাব থেকেই বন্ধুরা হিসাব-পত্রের বহু কাগজ বুড়োকে গছিয়ে দিলেন এবং তিনি সেগুলোকে বয়ে এনে জমা কর্তে লাগলেন।

আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার হতে লাগল এক নাটকের ন্যায়। কাগজ বোগলে করে আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন। বল্‌তেন ঃ দেখ এলাম, এ কাজগুলো অত্যন্ত জরুরী ও জটিল। আমি বন্ধুদের বলেছি তোমার মত এত ত্বরিত, এত নিখুঁত কেউ কর্তে পার্বেনা।

www.pathagar.com

আশা করি, তুমি আমার মুখ রাখবে।

আমি অবিশ্যি নিজের কাজ সেরে এই কাজগুলো মন দিয়ে কর্তে লাগলুম। পরের দিন সাহেবকে 'গুড মর্ণিং' বলে যেই দাঁড়িয়েছি তবেই সেরেছে আর কি। তিনি অমনি গজরাতে শুরু করেন। 'আমি তো কোন কাজ কচ্ছিনে। তুমি একটা গুরুতর কাজ নিয়ে আছ। আমাকে দেখে দাঁড়ালে তোমার চলবে কেন!

তার চেয়ে আমি বসেই কাজ কর্তে থাকব। তিনি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াবেন। হাতে ব্লটিং পেপার তুলে নেবেন। যেই আমি যতিতে পৌঁছেছি ব্লটিং পেপার চেপে দিয়ে বলবেন ঃ এবারে এলাম, তোমার সাথে আমার কিছু আলাপ আছে।

তবে, কাজ আমাকে কখনও ক্লান্ত করে না। আর, তখন থেকে আরম্ভ করে ক্রমেই এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হয়েছে সব কাজই আল্লার কাজ, কোন কাজই ফেল্‌না নয়, আর শেষ পর্যন্ত কোন কাজই প্রতিদান ছাড়া যায় না।

বেইস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোরে আমি সাড়ে দশ মাসের মত ছিলাম। অতঃপর ডাক আসে পল্টন থেকে ঃ ফিরে এসো আমরা ইণ্ডিয়া চলে যাচ্ছি।

ফ্রান্সিসের বাংলোতে গেলুম দেখা কর্তে।

ফ্যান্সিস চাচ্ছিলেন দেশে ফিরে গিয়ে আমি ডাক্তারী পড়ি, ডাক্তার হই। তিনিও ডাক্তার। আমার সাড়া না পেয়ে রাগ করে আছেন। তারই কিছু উষ্মা বেরিয়ে পড়লো। বল্লেন ঃ আমরা কাউকে প্রশংসা পত্র দেই না। আমি বল্লুম ঃ আমারও প্রশংসা পত্র চাওয়ার অভ্যাস নেই। একটা মামুলী বিদায় নিলুম।

কিন্তু, আসল বিদায় বোঝা গেল কিছু পরে। আমি যত সংস্থার মাধ্যমে পল্‌টনে ফিরে এলুম প্রত্যেকের ডাক্তারের নিকট ফ্রান্সিস জানিয়ে দিয়েছেন ঃ আমাদের পেয়ারের লোক ৮৯১ অমুক ট্রানসিটে তোমার ইউনিট হয়ে যাচ্ছে, সে যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে। আর ডাক্তারেরা আমি পৌঁছা মাত্রই খোঁজ করে সার্টিফিকেট দিতে লাগলেন ঃ অসুস্থ, নো ডিউটী।

পল্টনে ডাক্তার যদি বলে অসুস্থ 'নো ডিউটী' এমন বাপের বেটা নেই যে আপনাকে কাজ করাতে পারে। তবে ট্রানসিট শেষ হয়ে যখন নিজের পল্টনে পৌঁছলুম তখন সব ডিউটীই আমাকে কর্তে হচ্ছে।

তারই মাঝে হঠাৎ একদিন শোনা গেল ঃ ডে অর্ডারলী হাবিলদার হাঁকছেন '৮৯১, সি-ওর (কমাণ্ডিং অফিসারের) অফিসে ডাক পড়েছে'।

শুনে ভারী ভয় ধরে গেল। কারণ অফিসে যে কাজ হরদম চলে তা হলো কোর্ট মার্শাল। কোন অপরাধ করে বসেছি কি নারে বাবা! কোর্ট মার্শালে ডাক পড়ে কেন ?

হাবিলদার আমাকে যথারীতি পেশ কর্লেন ঃ কোর্ট মার্শাল নয়, আমাদের সি-ওই এরীয়া কমাণ্ডার, তিনি এরীয়ার একটা দরবার কল্ করেছেন। এরীয়ার অনেকগুলো

www.pathagar.com

অফিসার এসে আসন গ্রহণ করেছেন। তাদের কাঁধের তারা ও মুকুট ঝক্ ঝক্ কচ্ছে।

সি-ওর হুকুম নিয়ে এ্যাড্জুট্যান্ট কেপ্টেইন ঈ ডব্লিউ বি গিব্স্ একখানি সার্টিফিকেট পড়তে লাগলেন যা বেইস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোর্সের সি-ও পাঠিয়েছেন ৮৯১ সম্বন্ধে। এত প্রশংসা 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উচ্চমানের দক্ষতা'। আমি যেন শুন্‌তে পাচ্ছি ম্যাকইলওয়েনের গলা, পেছনেই বুড়ো ফ্রান্সিস সঙ্গে সব ক্লাবের সাহেবেরা যাঁদের কাজ আমি করে দিয়েছিলুম।

কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ভি ভি স্যাণ্ডিফোর্ড মন্তব্য কর্লেন ঃ "আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। সকলে হাত তালি দিয়ে উঠলেন।

www.pathagar.com

অমিশুক ও অতি-মিশুক

অমিশুক, নিঃসঙ্গ লোকের জন্য পল্টন বড় বেখাপ্পা জায়গা।

কলিকাতার কাজী খলিল ছিলেন তেমন এক লোক। (আসল নাম দিলাম না) কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা প্রায়ই দ্বিভাষী। উর্দুও বল্‌তে পারেন, বাংলাও বল্‌তে পারেন। তেমন লোক কাজী খলিল পল্টনে ঢুকেও ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। মিলিটারী ডিউটীর জন্যে য়্যুনিফর্ম পরে পাঁচ হাতিয়ার বেঁধে সারাক্ষণ প্রস্তুত থাক্‌তেন। ওদিকে অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যেও নামাজ আদায় কর্তেন, রোযার দিনে শেষ রাত্রে সেহ্‌রী খেয়ে রোযা রাখ্‌তেন।

এ সকল গোঁড়া লোকের জন্য সহানুভূতিশীল কোম্পানী কমাণ্ডার প্রয়োজন—যিনি তাদের বুঝতে পারেন।

আমাদের ডি কোম্পানীর কমাণ্ডার কাপ্তেন বি জে য়্যামিস ছিলেন তেমন এক লোক। সিভিল জীবনে তিনি ছিলেন পেশাদার ব্যারিষ্টার।

যুদ্ধের ঠেলায় আর্মীতে ঢুকে কাপ্তেন হয়েছেন। তাঁর একটা নীতি ছিল ঃ অধঃস্তনদের শাস্তি দিতে হলে নিজেই যা পারেন দিতেন। কিন্তু অফিসার কমাণ্ডিং-এর কাছে রিপোর্ট করে তাঁর নিত্যকার কোর্ট মার্শালে পেশ করে শাস্তি দেওয়াতেন না।

পরে যুদ্ধ-ফেরৎ হয়ে আমি ৩৪ বৎসর সরকারের সিভিল চাকুরি করি। তাঁর এই নীতি অনুসরণ করে আমি যথেষ্ট সুখী হয়েছিলেম।

কিন্তু কাজী খালেকের বি কোম্পানীতে কমাণ্ডার হয়ে আস্‌লেন কাপ্তেন সি জি ওয়েবষ্টার। তিনি ছিলেন প্যাসেঞ্জার অর্থাৎ শূন্য পূরণ করার জন্য অস্থায়ী ভাবে বাঙ্গালী পল্টনে এসে পড়েছেন, শীঘ্রই তাঁর নিজের পল্টনে চলে যাবেন।

এর রকম অফিসারের অসুবিধে এই যে কমাণ্ডের লোকজনের সাথে এদের কোন আন্তরিকতা গড়ে ওঠে না। ফলে কোন কোন সময় ভয়ানক অনর্থের সৃষ্টি হয়।

ওয়েবষ্টার ছিলেন বিরাট এক গোল-মুখ, তার উপর কিরূপ একটা বোকামির ছাপ

www.pathagar.com

ছিল। একবার প্যারেডে এমন এক আদেশ দেন যে সেটা মান্‌তে গেলে তাঁর গোটা কোম্পানী শাতিল আরব নদীতে যেয়ে পড়্‌তো। তবে, তিনি অফিসার কমাণ্ডিং-এর জাত ভাই। ব্যাপার দেখে অফিসার কমাণ্ডিং তাঁকে সংশোধন করে দেন এবং যাতে তিনি অপ্রস্তুত না হন এজন্যে আরও সাহস দিয়ে বলেন ঃ নেভার মাইণ্ড ওয়েবষ্টার।

আমাদের কাছে ওয়েবষ্টার ছিলেন এক হাসির বস্তু। তাঁর চোখ ও হাত মাছি ধরার জন্য খুব ক্ষিপ্র ছিল। মাছি ধরে সেটাকে চোখের কাছে নিয়ে দেখ্‌তেন আর মুখে এমন কসরৎ কর্তেন যে দেখে মনে হতো ওয়েবষ্টার সাহেব মাছি ধরে ধরে খাচ্ছেন।

ওয়েবষ্টার সাহেব কাজী খালেকের বিরুদ্ধে অফিসার কমাণ্ডিং-এর নিকট রিপোর্ট করে বস্‌লেন।

অফিসার কমাণ্ডিং-এর প্রাত্যহিক কোর্ট মার্শালে য়্যাডজুটেন্ট দোষী সৈন্যকে পেশ কর্তেন। সৈন্যকে প্রায়ই কিছু বলার সুযোগ দেয়া হতো না। য়্যাডজুটেন্টের রিপোর্ট শুনেই অফিসার কমাণ্ডিং শাস্তির আদেশ শুনিয়ে দিতেন ঃ প্রায় ২৮ দিন জেল অথবা ৩২ ঘা বেত।

জেলকে সৈন্যরা গায়ে মাখ্‌তো না। কিন্তু ৩২ ঘা বেতকে ভয় কর্তে হতো। কারণ, রত্তন নামক চিকন বেতকে গোছা করে গণ্ডের আগায় বাঁধা হতো। এক ঘাতেই অনেক ঘায়ের কাজ হতো, পিঠের চামড়া কেটে বেত মাংসে বসে যেতো। এমন সৈন্য ছিল না মারের চোটে যে বেহুঁস হয়ে পড়ে না যাবে। অবশ্য, একজন ডাক্তারও হাজির থাকতেন।

একদিন হঠাৎ জেনারেল ফল-ইনের আদেশ হলো অর্থাৎ মাঠে গোটা ব্যাটালিয়ানের সমাবেশ। আনুষ্ঠানিকভাবে অফিসার কমাণ্ডিং আসলেন, প্রহরী পরিবৃত করে কাজী খালেককে আনা হলো, য়্যাডজুটেন্ট ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন যে কাপ্তেন ওয়েবষ্টারের প্রতি ডাম্ব ইন্‌সোলেন্স-এর জন্য কাজী খালেকের প্রতি ৩২ ঘা বেতের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। সকলের মনে হলো ঃ ওয়েবষ্টার হয় ভুল, নয় শয়তানি করেছেন। 'ডাম্ব ইন্‌সোলেন্স মানে নীরব বেয়াদবী'। কোনরূপ বেয়াদবী কর্বেন কাজী খালেক সেরূপ লোকই নন্‌। আর 'নীরব বেয়াদবী' জিনিষটাই বা কি।

তবুও কাজী খালেকের প্রতি ৩২ ঘা বেত বর্ষিত হয়ে গেলো। এক অমিশুকের দুর্ভাগ্য!

কিন্তু, অতি মিশুককে নিয়েও বিপদ কম নয়। আমার সঙ্গে খাতির জোটালেন ময়মনসিংহের ছৈয়দ আবেদ। (আসল নাম দিলেমনা) ফর্সা সুন্দর লোক, মুখে আভিজাত্যের ছাপ, চোখ দুটি বেশ মায়াময়। আমাকে দোস্ত ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

আমরা কয়েকজন যার যার কীচেন থেকে খাবার নিয়ে এক সঙ্গে বসে খেতুম। অল্পদিনেই আমি লক্ষ্য কর্লুম যে রোজই আমাকে র‍্যাশন-টিন ধুয়ে পরিষ্কার কর্তে হয়,

www.pathagar.com

আর ছৈয়দ আবেদরা খেয়েই খালাস, আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করাটা আমার জন্য থেকে যায়। তখন আমি এঁদের সংসর্গ ত্যাগ করলুম। ছৈয়দ আবেদ আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান গাইতে লাগলেন ঃ ভুল করে ভালবেসে এত যন্ত্রণা!

শীঘ্রই ছৈয়দ আবেদ এক বিপদে পড়ে গেলেন।

একটা এলাকার বহু জায়গায় আমাদের পাহারা দিতে হয়। একটা জায়গার নাম ডাম্প। এখানে বহু খাবার জড়ো করে রাখা হয়েছে। বেশীর ভাগই নানা টিনে ভর্তি খাদ্য—গোস্ত, মাছতো আছেই, এন্তার ফল-মূল ঃ আনারস, নাশপাতি, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি। আমাদের কাজ হলো পাহারা দেওয়া, এর হিসাব কিতাব রাখে অন্য লোকে। কিন্তু, তারা সব সময় হাজির থাকে না।

ছৈয়দ আবেদের ডিউটী পড়েছিল ডাম্পে। খাবারের স্তূপ দেখে তো তাঁর চক্ষু স্থির। তাঁর কয়েক টিন আনারস বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুলে খেয়ে ফেল্লেন, খালি টিন ফেলে দিলেন নদীতে। আর ডিউটী শেষে ফিরবার সময় বিস্তরায় (বিছানায়) বেঁধে কয়েক টিন নিয়ে আসলেন।

কিন্তু তাঁরা পৌছানোর আগেই য্যাডজুটেন্টের নিকট সাঙ্কেতিক বার্তা পৌছে গেল। য়্যাডজুটেন্ট তাঁরা ফেরা মাত্রই বিস্তরা তালাশ করে চোরাই মাল ধরে ফেল্লেন।

কোর্ট মার্শালে এঁদের প্রত্যেকের প্রতি ৩২ ঘা বেতের আদেশ হয়। ছৈয়দ আবেদকে কয়েকদিন মৃত বৎ পড়ে থাকতে হলো। অতঃপর অতি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠ্লেন।

পল্টনে অনেক রকমের লোক আসে। পরিণামে 'কবুতরের সঙ্গে কবুতরের' 'বাজের সঙ্গে বাজের' পরিচয় হয়ে যায়। তখন খুব সখ্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমিও ছৈয়দ আবেদ দু' টাইপের লোক ছিলুম। সেজন্যে তাঁর সঙ্গে আমার দুস্তি টিকে থাকলোনা।

www.pathagar.com

নল থাকবে আকাশমুখী

যুদ্ধ বিদ্যার কত অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এখনও সেনাবাহিনীর আসল অংশ হলো পদাতিক দল আর তার হাতে শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র হলো বন্দুক।

বন্দুকের যে পেটে গুলি ভরা হয় (অবশ্য হাতে নয়, কলে) তার নাম ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিন থেকে নলের শুরুর অংশ চেম্বার। 'চেম্বারে গুলি আছে' ঃ এর অর্থ হলো গুলি উদ্যত হয়ে আছে' ঘোড়া টিপলেই ফায়ার হয়ে যাবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অংশ থাকে। যে অংশটা সবচেয়ে গরম সেখানে বন্দুকে গুলি পোরা থাকে, এমনকি চেম্বারেও প্রস্তুত।

কিন্তু, কম গরম অংশে গুলি সর্বক্ষণ পোরা থাকে না। তবুও তো বলা যায় না, সৈন্যের হাতের বন্দুক—এজন্য প্রতি প্যারেডের শেষেই একটা প্রক্রিয়া আছে—যার নাম 'আনলোড'।

'আনলোড' এর পর ধরে নেওয়া হয় যে বন্দুকে আর গুলি নেই। তাকে ভয় কর্বারও আর কোন কারণ নেই।

দুর্গা আর বিজয় একই তাঁবুর দুই বন্ধু। দিল্লেগী কর্তে দুর্গা বিজয়ের বুকে তাক করে বল্লে ঃ মারব এক গুলি। বিজয় হাস্‌তে হাস্‌তে বুক চিতিয়ে বল্লে ঃ মার দেখি। দুর্গা ঘোড়ায় হাত দিয়ে কসরৎ কর্তেই বন্দুক গর্জে উঠল 'গুড়ুম'। গুলি বুক ভেদ কর্তেই আর্তনাদ করে বিজয় পড়ে গেল—পাথরের মত মৃত। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাও অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল।

কোর্ট মার্শাল হলো। দুর্গার সাজাও হলো—২৮ দিন জেলে—যেটা মামুলী।

অভিজ্ঞ সেনাপতিরা বল্লেন ঃ 'আনলোড'-এ বল্টু পুরো না টানলে অনেক সময় এক-আধটা গুলি ম্যাগাজিনে থেকে যেতে পারে।

তখন থেকে আদেশ হলো ঃ নল আকাশ মুখী ছাড়া কোন অবস্থাতেই বন্দুক নাড়া-চাড়া কর্তে পার্বে না। এই আদেশে আমরা পোক্ত হয়ে গেলুম।

www.pathagar.com

পল্টনে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন কুমার অধিক্রম মজুমদার এম-এ, এ, বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট। তাঁর উষ্মা হলো ঃ তোমরা মুসলমানেরা কেন এলে ? বাঙ্গালী পল্টনে মুসলমানও আস্‌বে এটা যেন তিনি নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছিলেন না।

মুসলমানদের মধ্যে আমি ছিলুম সবেধন নীলমণি যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে এবং কলেজের মুখ দেখেছে।

আশ্চর্যের বিষয় ঃ অল্পদিনের মধ্যেই সুবেদার মজুমদার আমার দিকে ঝুঁকলেন। আমার লেখা-পড়া হলো তাঁর পরম নির্ভর। এর এটা লিখে দেওয়া, ওর ওটা লিখে দেওয়া, আর তার বদলে আমার প্যারেড মাফ।

বিকেলের দিকে প্রায় অবসর থাকতো। আমি গিয়ে তাঁর তাঁবুতে বসতুম আর ডিসিপ্লিন বজায় রেখেও লেখাপড়ার জগতে সমানের ন্যায় তাঁর সঙ্গে মিশতুম। কোন কোন দিন ব্যাটালিয়ানের ডাক্তার কাপ্তেন জে আর ধর এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

কাপ্তেন ধর একদিন ফিট্‌জেরাল্ডের 'ওমর খৈয়াম' নিয়ে আসলেন। আমাকে তাঁবুতে এনে সেটা পড়তে দিলেন। এটা এমন জিনিস যেটা আপনাকে পালন করে দেবে।

একবার মক্-ফাইট হচ্ছিল। এর গুরুত্ব ছিল আসল যুদ্ধের মতই।

আমি ছিলাম সিগ্‌নেলার। সৈন্যদলের তিন এস্ বড় ভয়ংকর। স্কাউট—যে পথ বের করে, সিগ্‌নেলার—যে সাঙ্কেতিক বার্তা প্রেরণ করে, স্নাইপার—যে বিপক্ষের ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে তার সেনাপতিদেরকে গুলি করে মারে। প্রত্যেককেই প্রাণ হাতে করে কাজ কর্তে হয়। আর ধরা পড়েল নির্ঘাৎ শাস্তি— মৃত্যু।

মনোরঞ্জন ছিল লুইস গানার। এই হাল্কা ক্যাননগুলো ছিল তখনকার সৈন্যদের হাতে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। একবারে অনেকগুলো গুলি বের হয় আর সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে যে কোনদিকে সঞ্চালন করা যায়।

আমি আর মনোরঞ্জন গতিকে এক জায়গায় পড়েছিলুম। তখন সামান্য বিরতি ছিল। মনোরঞ্জন আমাকে তার কামানের সব কৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আমার ট্রিগারে হাত ছিল। হঠাৎ দুই বন্ধুতে এমন স্থান কাল-পাত্র উদ্দেশ্য ভুলে গেলুম যে মনোরঞ্জন বল্লে ঃ এবার টেপ, আমি ট্রিগার টিপে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজ করে ম্যাগাজিন একটা চক্কর খেয়ে গেল। সে আওয়াজে সকলে সচকিত হয়ে গেল, তার মধ্যে রয়েছে বৃটিশ অফিসারগণ—যাঁরা সুবেদার মেজরের উপরেও কর্তা।

ভারী বিপদ। নির্ঘাৎ কোর্ট মার্শাল আর জবর শাস্তি।

ভাগ্য ভাল। মজুমদার ছিলেন কাছেই তিনি আমাদের দুজনকে এমন বকাঝকা

www.pathagar.com

কর্তে লাগলেন যে, বৃটিশ অফিসাররা চোখ তুলে দেখলেন এবং ভাব্‌লেন যা করার সুবেদার করে ফেল্‌ছেন। তাঁদের আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। মজুমদার বকা-ঝকা করেই শেষ কর্লেন। এর বেশী কিছু ঘটতে দিলেন না।

বাড়ি এসে মনোরঞ্জন সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে ঢোকে। তারপর উভয়ের কোন যোগ নেই।

তবুও আর একটা ধকল বাকী ছিল। সেটা ঘটলো যখন বাড়ি এসে একদিন সেজে-গুজে শ্বশুর বাড়ি গেলুম—যেতে বাধ্য হলুম।

শ্বশুর-বাড়ীতে আমার এক দাদা শ্বশুর—শ্বশুরের চাচা ছিলেন অতি বিশিষ্ট লোক। ছেলে বেলায় রেঙ্গুনে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কালক্রমে এক ধনী বর্মিনীকে বিয়ে করেন, নিজে বিখ্যাত ব্যবসায়ী হয়ে পড়েন—এখন শেষ বয়সে দেশে চলে এসেছেন। ছেলেপুলে হয়নি। বর্মিনী রেঙ্গুন ছেড়ে আসতে রাজি হননি, তবে সোনা-চাঁদি হীরে জহরৎ স্বামীকে ভাগ করে দিয়েছেন।

দেশে এসে নূতন দালান-বাড়ি করেছেন, সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে সাজিয়েছেন আর কিনেছেন নূতন এক দোনলা বন্দুক।

খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি তাঁর বন্দুক আমার হাতে তুলে দিলেন। নাতিন জামাই যুদ্ধ ফেরৎ। বন্দুক হাতে না দিলে তার কদর হয় কিরূপে?

ঘোড়ায় আমি হাত দিয়েছিলাম। বন্দুক দেখতে গেলে ঘোড়ায় হাত যাবেই। আর তিনি সামনে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে সব দেখাচ্ছিলেন। বল্লেন ঃ ওই চেম্বারে গুলি নেই। তুমি ঘোড়া টিপতে পার।

কিন্তু টেপা মাত্রই বন্দুক গর্জন করে উঠল। উদগীর্ণ গুলি নল থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়ে আকাশপথে চলে গেল। তিনি অল্পের জন্য গুলি খাওয়া থেকে বেঁচে গেলেন।

সকলে 'হা, হা করে দৌড়ে এলেন। বুড়ো বল্লেন ঃ আমারই ভুল। তবে, নাত জামাইয়ের মিলিটারী শিক্ষা। বন্দুকের নল আকাশ-মুখী করেই ধরেছিলেন। তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলুম।

www.pathagar.com

মাহবুব-উল আলম চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ গ্রামে ১লা মে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' লিখেন। লেখায় জীবনের চিত্র ভেসে উঠে বলে তিনি জীবন-শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সাড়া জাগানো আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'মো'মেনের জবানবন্দী' ইংরেজী ও উর্দুতে অনুদিত হয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়। তাঁর বহু আলোচিত উপন্যাসিকা 'মফিজন' আজও আধুনিক শিল্পকর্ম রূপে সমাদৃত। তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্প সংকলন 'গৌফ সন্দেশ' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যে মৌলিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে তিনি সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার 'প্রাইড অব্ পারফরমেন্স', 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ও 'একুশে পদক' সহ বহু পুরস্কার লাভ করেন।

www.pathagar.com

১৯৫৩ সালে পেনশন প্রাপ্তির পর পরই মাহ্‌বুব-উল আলম 'জমানা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে নিজেকে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত করেন। সম্পাদকীয়ের বিষয় নির্বাচন ও রচনা-রীতিতে স্বাতন্ত্র্যের জন্য তিনি সাংবাদিকতায় পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে মাহ্‌বুব-উল আলম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে মার্কিন মুলুক সফর করেন এবং ফেরার পথে হজ্বব্রত পালন করেন।

৩২টিরও অধিক পুস্তকের রচয়িতা মাহ্‌বুব-উল আলম ৭ বছরের একাগ্র সাধনা ও একক প্রচেষ্টায় সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ ১২০০ পৃষ্ঠার 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' (চার খণ্ডে) রচনা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এটিই শেষ গ্রন্থ। তাঁর মরণোত্তর হাস্য-রসাত্মক গল্প সংকলন 'প্রধান অতিথি ও তাজা শিংগী মাছের ঝোল' পাঠক মহলে বিপুল সাড়া জাগায়।

তিনি ১৯৮১ সালের ৭ই আগষ্ট কাজির দেউড়ীস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

'তাঁবু আমাকে পীড়িত করে; আমি আমার মনের নোঙ্গর খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি অলসভাবে নরম বিছানায় শুইয়া শিশু-সূর্যের মুখ চাহিতে চাহিতে এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ দুধ পান করিতে চাই আর উহারই মাঝে অনুভব করিতে চাই যে মানুষ আমার ভাই। মানুষকে শত্রু ভাবিতে ভাবিতেই আমি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি।'

মাহ্‌বুব-উল আলম

www.pathagar.com